প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৭
আগষ্ট ১৯৬০

প্রকাশক
সমীরণ মজুমদার
অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ
বীণালয়, ডাকবাংলো রোড
মেদিনীপুর-৭২১১০১

মুদ্রক
সুকুমার দে
বাসন্তী প্রেস
কলকাতা-৬

সূচীপত্র

ঐতিহ্য ও টি. এস্. এলিয়ট্

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কবিদের কাণ্ডয় জনসাধারণ যতই হাস্থক না কেন, তবু তাদের সম্বন্ধে কিংবদন্তীর অন্ত নেই ; এবং এই রূপকথাগুলোর মধ্যে যেটা সব চেয়ে দুর্মর ও রহস্যময়, সে হচ্ছে প্রেরণা-নামক এক অলৌকিক শক্তি। যাঁরা কবিতা লেখেন না, শুধু পড়েন, যাঁরা লেখা-পড়া কিছুরই ধার ধারেন না, তাঁরা যদি ভাবেন যে কাব্যরচনার জন্যে বুদ্ধি-বিদ্যা, শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা-সংযম, এ-সমস্তই অনাবশ্যক, প্রয়োজন শুধু অখণ্ড অবসর আর অপার দৈবানুগ্রহ, তবে প্রতিবাদ করে লাভ নেই, কেননা কার্য-কারণ-বিবিধ প্রাত্যহিক ব্যাতিক্রমই নৈমিত্তিক জীবনের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু যখন কাব্যরচয়িতা বা কাব্যবিবেচকদের মধ্যেও অনেকে এই উপকথার প্রশ্রয় দেন তখন কাব্যজিজ্ঞাসুর পক্ষে বিস্ময়বোধই একমাত্র মনোভাব ; এবং এ-কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে শিল্পী ও কারুকর্মী—আর্টিস্ট্ ও আর্টিজান,—এদের উদ্যোগে কোনও মূলগত প্রভেদ নেই, পার্থক্য শুধু এদের মানসিক সংগঠনে। অর্থাৎ কারুকর্ম একটা চিরাচরিত প্রথার নিশ্চিন্ত অনুকরণ : তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই, তার গোড়ায় নেই এষণার একাগ্রতা ; কিন্তু শিল্পসৃষ্টি উদ্বুদ্ধ চৈতন্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত : তার প্রত্যেক অঙ্গ সজীব ও অপরিহার্য, প্রত্যেক অলঙ্কার বহু পরীক্ষার ফল।

তার মানে এ নয় যে রূপকার আদর্শমুক্ত ; বরং উল্টোটাই তার পক্ষে বেশী সত্য। কিন্তু ঐতিহ্যব্যতিরেকে—ট্র্যাডিশন্ ব্যতীত—শিল্পসৃষ্টি যদিও একেবারে অসম্ভব, তবু তার অনুবৃত্তি প্রাণহীন নয়, সঙ্কল্পের সংস্পর্শে সঞ্জীবিত, তার অনুকরণের উদ্দেশ্য উদ্ভাবন। হয়তো সেই জন্যে কখনও কোনও যথার্থ আর্টিস্ট্‌কে স্বয়ম্ভু বলে বোধ হয় না ; এবং তার আত্মপরিচয় গোত্রপরিচয়ের মধ্যে নিহিত বটে, কিন্তু তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পারিবারিক ইতিহাসে রূপান্তর ঘটায়—যে ঐতিহ্যপরম্পরায় সে অনুপ্রাণিত, তার স্বরূপ বুঝতে গেলে, আগন্তুককে আর বাদ দেওয়া চলে না। ফলত কোনও একটা নির্দিষ্ট কাব্যধারা নদীর সঙ্গে তুলনীয় নয়, তাকে একখানা অসমাপ্ত অট্টালিকার মতো লাগে ; এবং এই অট্টালিকার সূত্রপাত মানুষের প্রয়োজনসিদ্ধির খাতিরে, এর বৃদ্ধি মানুষের মর্জিতে, এর ধ্বংসও মানুষের অযত্নে। শুধু তাই নয়, এই অট্টালিকার ভবিষ্যৎ বিস্তার ভিত্তিস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই, অংশত নির্ধারিত, আবার প্রত্যেক যোগ-বিয়োগে তার অঙ্গসঙ্গতি বদলায় ; এবং তার মৌল প্রকৃতি যেমন সংযোগমাত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনই সংযোগমাত্রেই

তাতে পরিবর্ত্তন আনে।

উপমাটা উপযোগী কিনা জানি না, কিন্তু এটা নিশ্চয় বুঝি যে সৎকবিরা অতিচেতন মানুষ: অদৃষ্টের অনুগ্রহে তারা যদিও বঞ্চিত নয়, তবু তাদের কীর্তিতে প্রকৃতির চেয়ে পুরুষকারের প্রসাদ বেশী। এই সত্যকেই ঘুরিয়ে বলতে পারি যে রূপসৃষ্টির অনেকখানি সমালোচনার অন্তর্গত। যিনি মহাকবির মর্যাদা চান তাঁর পক্ষে প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির দক্ষ নির্বাচনই যথেষ্ট নয়; সে-জন্যে প্রাচীন ও অর্বাচীন কাব্য-রচনার যথাযথ মূল্যবিচারও অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কাব্যের স্বভাব-সম্বন্ধে, সাহিত্যের ইতিহাস ও পরিণতি-সম্পর্কে কবিমাত্রেই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য, এবং এই বিশ্বাসের প্রমান স্বরূপ বেন্ জন্সন, ড্রাইডেন, কোল্‌রিজ ইত্যাদির মতো বিশ্ববিশ্রুত কবি-সমালোচকদের দৃষ্টান্ত মানার দরকার নেই, ইংরাজী সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। কারণ শিশুপাঠ্য পুস্তক থেকেও প্রমান পাই যে অন্তত ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে সাহিত্যের নব যুগ কখনও বিনা আয়োজনে প্রবর্তিত হয়নি; এবং অন্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় যেহেতু পরোক্ষ, সে-প্রসঙ্গে শুধু তাই বাগ্‌বাহুল্য অশোভন। তবে অ্যারিস্টফেনিস্-এর প্রহসন পড়লে, এ-ভুল চোকে যে গ্রীক্ সাহিত্যের আদর্শ-সম্বন্ধে একা অ্যারিস্টট্‌ল্ উৎসুক ছিলেন; এবং গ্যেটে, শিলার, লার্মণ্টফ, টল্‌স্টয়্, ইব্‌সেন্, ষ্ট্রিণ্ডবের্গ, কাদুর্চি, এমনকি টুর্গেনিভ্ ও য়েট্‌স্-এর মতো বিশুদ্ধ শিল্পীরাও, সাহিত্যিক বাদানুবাদের জন্যে প্রসিদ্ধ।

পক্ষান্তরে সেক্‌সপীয়র-এর মতো দু-একজন মহাকবি মেলে, যাঁদের শিল্পাদর্শ-সম্বন্ধে কোনও বৃত্তান্ত আমাদের জানা নেই, যারা প্রকাশ্যে কোনও থিওরির বিষয়ে মাথা ঘামায়নি, তেমনই অখ্যাত, অনাড়ম্বর ও স্বতঃসিদ্ধভাবে অমর কাব্য লিখে গেছেন, যেমন অজ্ঞাতসারে চলে সাধারণ প্রাণীর জীবনযাত্রা। কিন্তু তাঁর নিশ্চেষ্টা ও নির্ভাবনা আমাদেরই কপোলকল্পিত কিনা, তাও বিবেচ্য। কারণ যে কবির জিজ্ঞাসা সিনেকা, মেকিয়াভেলি, মঁতেইদের মতো বিপরীতধর্মী দার্শনিকদের দুরূহ মতবাদকে অত সহজে পরিপাক করে ফেলেছিল, যার কৌতূহল প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র, জ্যোতিষ, পুরাণ, রূপকথা, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি মানুষী সভ্যতার কোনও উপকরণকে বাদ দেয়নি, মানব-সম্পর্কীয় গবেষণায় যে ব্যক্তি সম্ভবত চিত্তবিকারকে সুদ্ধ নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েছে, কেবল নিজের জীবিকার মূলানুসন্ধানে সে নিরাগ্রহ, এমন বিশ্বাস কেমন যেন খাপছাড়া। উপরন্তু শেক্‌সপীয়রী কলাকৌশলের অস্থৈর্য সুপরিচিত; এবং এই পরীক্ষাপ্রবণতা একমাত্র জিজ্ঞাসু মনের লক্ষণ।

তাহলেও এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে সমালোচনার তাগিদ সকল কালে সমান নয়; এবং শেকস্‌পীয়র-এর সময় যতখানি কাব্যবিবেচনা কবিদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল, আমাদের যুগে তার পরিমাণ বহু গুণ বেড়েছে। অর্থাৎ কলা-

শুদ্ধির পুরোধারা আর্টের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যতই বাড়াবাড়ি করুন না কেন, তবু একেবারে জীবন্মুক্ত মানুষ বন্ধ্যাপুত্রের চেয়েও দুর্লভ; এবং জীবন যেহেতু শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার বিকল্পে তরঙ্গায়িত, তাই শিল্পপ্রসূ সামঞ্জস্য-সাধনের প্রয়োজন কোনও সময়ে উহ্য, কখনও বা ব্যক্ত। আসলে সাহিত্যের মূল সমস্যা আর দর্শনের সনাতন প্রশ্ন, এ-দুটিকে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ঠেকলেও এদের পার্থক্য কেবল ভাষার, ভাবের নয়। শুধু কবি নয়, আমার বিশ্বাস ভাবুক-মাত্রেই যে-রহস্যের উদ্‌ঘাটনে বদ্ধপরিকর, সে হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির, বিশেষ ও সাধারণের সম্পর্ক। যে-সময়ে সমাজবন্ধন নিবিড়, যখন লোকোত্তর আদর্শের প্রতি মানুষের ভক্তি অচলা,—যেমন দেখি মধ্য যুগের য়ুরোপে—তখন কাব্যবিবেচনা স্থগিত রেখে, মুখ্যত অনুকরণের সাহায্যেই কাব্যরচনা সম্ভব। কিন্তু যখন উপনিপাত বিশ্বব্যাপারের ছত্রপতি, যখন অতি-জীবিত আদর্শকে আঁকড়ে থাকা মারাত্মক—যেমন আমাদের যুগে—তখন স্রষ্টা আর সমালোচক প্রায় সমার্থবাচক।

এলিজাবেথী ইংলণ্ড এই দুই সীমান্ত প্রদেশের মধ্যবর্তী। সেখানে কবিত্ব গণ্য, মান্য উপজীবিকাগুলোর অন্যতম ব'লে বিবেচিত হত না বটে, কিন্তু সুকুমার বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে-দিনকার সমাজে কবির উপকারিতা শূন্যে এসে ঠেকলেও, নবরত্ন-সভার শিরোমণি হিসাবে সে তখনও সমাদৃত। সে-কালের ভাবুক ন্যায়নিষ্ঠ বিধাতার সম্বন্ধে শুধু শ্রদ্ধা হারিয়েছে, মনুষ্য-জীবন যে দৈবেরই খেয়ালে উপদ্রুত সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ পায়নি। সে-অবস্থায় অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সাংঘাতিক সংঘাত স্বভাব-সিদ্ধ নয়। তখন পঙ্গু সমাজের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে যদিও কষ্টকর তবু সে-অসঙ্গতির জন্যে সমাজকে কেউ দোষ দিচ্ছে না, বলছে ব্যক্তিই উৎকেন্দ্রিক। আমার বিশ্বাস শেক্‌স্‌পীয়র্-এর মনোভাবাও গোড়ার দিকে এ-মতের বিরুদ্ধে যায়নি। অবশ্য তিনি নাটকের ধ্রুপদী আদর্শে কোনও দিন আস্থা দেখাননি। কিন্তু এখানে শেক্‌স্‌পীয়র আবিষ্কারক নন, অনু-সারকমাত্র। তাঁর কলম ধরার আগে থেকেই ইংরাজী নাটকের নব বিধান এমনই আসর জমিয়ে বসেছিল যে রূপান্তরের কথাও কারও মাথায় ঢোকেনি। সেই জন্যে বেন্ জন্সন্ যখন প্রাচীন পদ্ধতির পঙ্কোদ্ধার করলেন, তখন তাঁর ভাগ্যে সাধুবাদের চেয়ে পরীবাদই জুটেছিল বেশী।

সে যাই হোক, নাটকের তৎকালীন আদর্শকে শেক্‌স্‌পীয়র আমরণ মেনে চলতে পারলেন না। হ্যাম্‌লেট্‌-রচনার সময়ে তাঁর মধ্যে বিরোধ প্রাধান্য পেলে; এবং তারই ফলে অন্তকালে হ্যাম্‌লেট, ওথেলো-র চরমোক্তির প্রতিধ্বনি করলে না। কারণ সে ছিল আধুনিক কালের অগ্রদূত, ব্যক্তিবাদের প্রথম ভয়াবহ বিকাশ; তার মুখ দিয়ে শেক্‌স্‌পীয়র এমন স্বতন্ত্র, এতই স্বকীয় কথা বলতে চেয়েছিলেন যে সে-চরিত্রের রহস্য চির দিনই সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত থাকবে;

এবং এক বার এই অনন্যগোচর পথে চলার পরে প্রাক্তন অবস্থায় ফিরতে আর তাঁর মন সরেনি। তাই তাঁর শেষ জীবনের তথাকথিত কমেডিগুলো অত দুর্বোধ্য, অমন বিশৃঙ্খল; কোনও গতানুগতিক কাঠামোয় মূর্তিগঠনের চেষ্টা সেগুলোয় নেই, আছে কেবল স্বকীয়তাপ্রকাশের অসম্বদ্ধ আনন্দ। হয়তো শুধু এই জন্যে অত তিক্ততা, অত হিংস্রতা, অত বৈষম্য সত্ত্বেও, সেরচনা-কটিকে সমালোচকেরা কমেডির পর্যায়ে ফেলেছেন; এবং ষোড়শ শতকেই যখন স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা অত বেড়ে উঠেছিল, তখন বিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তন স্বভাবতই আবশ্যিক। কিন্তু রিনেসেন্স-এ যে-আদর্শবিপর্যয়ের সূত্রপাত, সেটা সমগ্র সমাজের ক্রমোন্নতির ফল; এবং এই বিবর্তনের চূড়ান্তে পৌঁছাতে যেহেতু প্রায় চার শ বছর লেগেছে, তাই এত দিন পর্যন্ত বিপ্লবের আকস্মিক ও আপতিক রূপটা কারও চোখে পড়েনি, লোকে ভেবেছে ব্যাপারটা পরিবর্তন নয়, পরিবর্ধনমাত্র।

উন্নতির এই নাতিচেতন দিকটা সুবিদিত; এবং এরই আশঙ্কায় উনিশ শতকের ভাববিলাসী কবিরা রটিয়েছিলেন যে মহৎ কাব্য দুঃখোদ্ভূত, সন্তুষ্টি কবিপ্রতিভার চিরশত্রু। বিশ্বসাহিত্যের পর্যালোচনায় যদিও ধরা পড়ে এ-মত অগ্রাহ্য, তবু এ-কথা সত্য যে দুঃখ মানবচৈতন্যকে জাগানোর একমাত্র উপায় না হলেও, প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের যুগে নিদ্রালু মন্থরতার স্থান নেই; এবং অধুনাতনী ধ্বংসলীলার ব্যাখ্যায় অভিব্যক্তিবাদের শরণ নেওয়া অসম্ভব। আমরা যে আজ ঐতিহ্যের শাসন-মুক্ত, ব্যক্তিকে সমষ্টির ভগ্নাংশ বলতে আমরা যে আজ অনিচ্ছুক, তার কারণ এ নয় যে পুরাতন আদর্শ প্রগতির প্রতিবন্ধক, তার কারণ শুধু এই যে আমাদের ইতিহাসে প্রগতি আর প্রলয়ের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই। সেই জন্যে যে-আদর্শ এই সর্বনাশ ঘটিয়েছে, শুধু তাতে নয়, প্রাচীন-অর্বাচীন, সকল আদর্শকেই আমরা তফাতে রাখি। সেই জন্যে আজকে আর আমরা কেবল বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলে বিশ্বাস হারিয়েই থামতে পারি না; সংখ্যা-শব্দটাকেও সন্দেহের চক্ষে দেখি। সেই জন্যে আমরা স্বাধীনতা খুঁজি না, চাই মাত্র নির্বিরোধ। কিন্তু সংসারযাত্রানির্বাহে এ-মনোভাবের প্রয়োজন থাক বা না থাক, সৌন্দর্যসৃষ্টির, অন্ততঃপক্ষে কবিতায় সৌন্দর্যসৃষ্টির, পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক।

সাম্প্রতিক শিল্পসেবীরা যে-সত্যটা প্রায়ই ভুলে যান, অথচ যেটা কলাবিদ্যার গোড়ার কথা, তা এই যে সুন্দরের উপলব্ধিতে অধিকারভেদ নেই, সে-স্বপ্ন অতিসাধারণ মানুষের দৈনিক অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। কাজেই রূপকারকে যদি মামুলী মানুষের থেকে আলাদা ক'রে দেখাই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে অভিজ্ঞতার উপরে জোর না দিয়ে, জোর দেওয়া উচিত অভিব্যক্তির উপরে। কারণ ভিতরে ভিতরে সকল মানুষ—এমনকি সকল প্রাণীই, সমধর্মী; তাদের অমিল কেবল রূপে, স্বরূপে নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে প্রেমের উপলব্ধি

সমান ও সার্বজনীন; কিন্তু রাম যেহেতু স্বর্ণলঙ্কা পুড়িয়ে প্রিয়বিরহের জ্বালা জুড়ায়, আর শ্যাম তার আবেগ জানায় বেণুবাদনে, তাই রামের প্রেমে আর শ্যামের প্রেমে একটা তফাৎ এসে জোটে, এবং কলাভিজ্ঞেরা ভাবতে পারেন যে আধেয় শিল্পের সারবস্তু নয়, সে-সম্মান আধারেরই প্রাপ্য। তবে কাব্যের আধার সম্বন্ধেও একটা প্রশ্ন ওঠে। যে-মাল-মসলায় সে-আধার তৈরী, তা ভাষা; এবং ভাষা মানবসভ্যতার প্রথম ও প্রধান উপকরণ। অতএব কবির পক্ষে অবচ্ছিন্নতা তো দূরের কথা, এমনকি নির্দ্বন্দ্বও প্রায় অসাধ্য। পূর্বে যে-দার্শনিক সমস্যার নাম নিয়েছি—অর্থাৎ ব্যষ্টি-সমষ্টির বিরোধ—এখানেও কবি তার সমাধানে বাধ্য; ব্যক্তিমানব কী উপায়ে বিশ্বমানবের সঙ্গে মিশবে, তার সন্ধানেই কবিপ্রতিভার একমাত্র সার্থকতা।

এই সঙ্গতিসাধন যে-ঐন্দ্রজালিক কৌশলে সিদ্ধ হয়, তার বিবরণ আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু এ-কথা কাব্যামোদিমাত্রেই জানেন যে মহৎ-আখ্যার উপযোগী যে-কবিতা, তার ভাষা আর ভাব, এই উভয়ের মধ্যেই একটা নৈর্ব্যক্তিক গুণের আভাস মেলে—অ্যান্টনি-র মতো সসাগরা ধরণীপতির প্রণয়ব্যাপারে ফুটে ওঠে মাছিমারা কেরাণীর জীবন। মহাকবিরা নিজেদের ভাষা নিজেরা বানিয়ে যান বটে, কিন্তু সে-ভাষা যখন চূড়ান্তে পৌঁছায়, তখন তার মধ্যে শোনা যায় নিত্যনৈমিত্তিক উক্তি-প্রত্যুক্তির প্রতিধ্বনি, প্রাকৃত ভাষার সবল সরল ও সজীব পদক্ষেপ, তখন আর শেক্‌স্‌পীয়র-এর ভাষা ব'লে কিছু থাকে না, ধরা পড়ে যে শেক্‌স্‌পীয়র জনসাধারণের সাবলীল ভাষা ধার নিয়েছেন। অথচ এতখানি আত্মত্যাগ সত্ত্বেও শেক্‌স্‌পীয়র-এর পৃথক পরিচয় হারায় না, বরং উজ্জ্বলতর রূপে দেখা দেয়; দুটো-চারটে অসংলগ্ন ছত্র পড়লেই বুঝি, সে-রচনা শেক্‌স্‌পীয়র-এর কিনা। এই অঘটনসংঘটনে যে দৈবপ্রসাদ নেই, এমন মতপোষণের মতো তথ্য আজও আমাদের আয়ত্তে আসেনি; কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে মহাশিল্পীরা কোনও অলৌকিক শক্তির প্রসাদ পান বা না পান, অন্তত লৌকিক বুদ্ধিতেও তাঁরা নিতান্ত নগণ্য নন। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সচেতন শিল্পী; এবং শিল্প-সৃষ্টির জ্ঞাত প্রকরণ স্বকীয় উদ্দেশ্যকে চোখের সামনে রেখে, অতীত ও বর্তমানের সমুদ্রমন্থন ক'রে উপযুক্ত উপায়ে সুসঙ্গত অবৈকল্য-নির্মাণ।

যে-কাব্যাদর্শের কথা তুললুম, তার জন্মদিন শুধু পুরাবিদেরাই জানেন। কেবল আমাদের যুগ নয়, সকল দেশ ও সকল কাল এই নিয়মেই কবিতা লিখে এসেছে, ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু নানা কারণে, প্রধানত রুসো-প্রবর্তিত ভাবপ্রবণ ব্যক্তিবাদের কল্যাণে, গত দু শ বছরের কবিরা, কাব্যরচনার সময়ে না হোক, কাব্যচর্চার বেলায় কবিপ্রতিভার সংযোগের দিকটায় জোর না দিয়ে, তার বিয়োগের দিকটা বাড়িয়ে দেখেছেন। এর ফলে হয়তো আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতার বিশেষ কোনও অনিষ্ট ঘটেনি, তবে জনসাধারণের মধ্যে যে কাব্যানুশীলনের ইচ্ছা কেবলই কমেছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ-অবস্থার প্রতি-

কার আছে কিনা তা তর্কাধীন; কিন্তু গত ত্রিশ বছর ধ'রে চিন্তাশীল কবিরা এই বিসংবাদ-সম্বন্ধে যে আর উদাসীন নেই, এটা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ। উনিশ শতকের শেষে অথবা বর্তমান শতকের আরম্ভে যাঁদের কাব্যজীবনের সূত্রপাত, তাঁরা প্রায় সকলে এক বাক্যে মেনে নিয়েছেন যে সম্প্রসারণ ব্যতীত কবিতা আর বাঁচবে না; তার লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করতে চাইলে, খেয়ালী কবিদের অনুকরণে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের অন্বেষণ বৃথা, সে-জন্যে জাতিগত চৈতন্যের অঙ্গীকার অত্যাবশ্যক।

এই মহাচৈতন্য কোনও একজনও মহাকবির অধিকারে নেই। সুতরাং কবিযশঃপ্রার্থীর পক্ষে কবিবিশেষের নাম জপা বিপজ্জনক। কবিমাত্রেই তার আরাধ্য এবং আলোচ্য; তার কাজ ব্যক্তিবিশেষের অপূর্বতা ও ব্যতিক্রমের বিশ্লেষণে স্বদেশের সাহিত্যিক মূল সূত্রের আবিষ্করণ। কিন্তু এই মূল সূত্র যেহেতু প্রত্যেক নূতন কবির বয়নেই অল্প-বিস্তর বদলে যাচ্ছে, তাই এ-বিষয়ে কোনও দুজন অনুসন্ধিৎসুর গবেষণা কখনও একই মীমাংসায় পৌঁছায় না; এবং মীমাংসা যখন আলাদা, তখন সেই মীমাংসার উপরে যে-নবানুষ্ঠান স্থাপিত, তাও চির দিন স্বতন্ত্র। জানি না কথাগুলো যুক্তির বিচারে হাস্যকর ঠেকবে কিনা; কিন্তু এ-সত্য অবশ্যস্মরণীয় যে কবি আর দার্শনিক যখন এক ব্যক্তি নয়, তখন কোনও নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে উভয়ের মুখে একই ভাষা শুনতে চাওয়া অনুচিত। আসলে জগতের বড় বড় সমস্যাগুলোর গুরুত্ব যদিও সকলের কাছে সমান, তবু তাদের আয়তন-সম্বন্ধে ভিন্ন স্তরের লোক স্বভাবতই ভিন্ন ধারণার বশবর্তী। কাজেই এমন বিশ্বাস অমার্জনীয় নয় যে নৈয়ায়িকের চক্ষে যে-রহস্য দুষ্প্রবেশ্য, সে-ব্যূহভেদের উপায় সাহিত্যিকের গোচর জন্মগত অধিকারে। তবে বেরিয়ে আসার কথা স্বতন্ত্র; এবং বেরোতে না পারলে, অন্য লোক নিয়ে তার ভিতরে ঢোকাও অসম্ভব।

অতএব বিশেষ-সাধারণের বিবাদ কবি যত সহজেই মেটান না কেন, তার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তাঁর কাছ থেকে না পাওয়াই সম্ভব; সে জন্যে হতে হয় দার্শনিকের দ্বারস্থ। কারণ কবিদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতপক্ষে দুর্বিনীত নন; তাই সচরাচর তাঁরা কোনও ব্যাপক সিদ্ধান্তে না পৌঁছে শুধু তাঁদের স্ব স্ব উপলব্ধির কথাই ব্যক্ত করেন। কিন্তু এ-নিয়মেরও ব্যত্যয় আছে; এবং আমাদের কালে যে-ইংরাজ কবির প্রভাব অতিবিস্তৃত, তিনি—অর্থাৎ টি. এস্. এলিয়ট—কোনও দিন দুরূহতার ভয়ে দার্শনিক মনোভাব ঝেড়ে ফেলেননি। তথাচ এমন অনুমান অন্যায় যে কবির দার্শনিক মনোভাব আর কবিতায় তত্ত্ববিচার এক জিনিস। অবশ্য দর্শন-শব্দকে খুব বিস্তারিত অর্থে ধরলে, শুধু কাব্যে কেন, মানুষের সকল প্রক্রিয়াতেই তার প্রসার দেখা যাবে। কিন্তু এই ভাবে অর্থঘন শব্দগুলির পরিসরবৃদ্ধি আমার অনভিপ্রেত। তাই দর্শন বলতে আমি মানবচৈতন্যের সেই দিব্যদৃষ্টিকে বুঝি না, যার আশীর্বাদে বিশ্লিষ্ট বস্তুবিশ্ব সম্বন্ধশৃঙ্খল

প'রে আমাদের বশে আসে, বুঝি মানবমস্তিষ্কের সেই চিন্তাশক্তিকে, যার চেষ্টা বিসংবাদ ঘোচায়, যার অধ্যবসায় বচনবিরোধের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতি আনে। এই অর্থে দর্শন আর যুক্তি অভেদাত্মা ; এবং দর্শনের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক শিথিল। কারণ অনুবন্ধনসৃষ্টি যুক্তির কর্তব্য, কাব্যের প্রাণ অভিজ্ঞতা-উৎপাদন এবং এ-দুই ধর্ম অন্যোন্যবিরোধী।

অভিজ্ঞতার স্বরূপে যুক্তির সংস্পর্শ নেই, সে নিজেকে পরম্পরার আকর্ষণে স'পে না, স্বয়ম্ভর অখণ্ডতায় তার বিশেষ গুণ। অবশ্য তাকে চাইলেও, যুক্তির দ্বারে ধরনা দেওয়া ছাড়া গতি নেই। তাহলেও সে যুক্তির শাসন মানে না, যুক্তিই তার কাছে মাথা নোয়ায়। তখন যুক্তির তপস্যায় প্রীত হয়ে, সে হয়তো বিদ্যুদ্‌বিলাসে চতুর্দিক একবার ঝলসে আবার প্রায়ান্ধকারে লুকায় ; কিন্তু অধিকাংশ সময়ে এই ক্ষণিকের আনন্দও যুক্তির ভাগ্যে জোটে না, সে অগত্যা সন্তুষ্ট থাকে প্রতিমাপূজায়, সত্তাশূন্য বস্তুরেখার ধ্যানে। মরমী সাধকেরা বহু পূর্বেই এ-সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ; তাই সকল দেশে এবং সকল কালে প্রজ্ঞা-কামীদের প্রতি তাঁদের উপদেশ যুক্তির দম্ভকে খর্ব করতে ; তাঁরা বলেছেন যে পরমার্থ-সম্বন্ধে শেষ কথা বোঝা নয়, উপলব্ধি। পুরোহিত এবং ঐন্দ্রজালিক, স্রষ্টা এবং মহানুভব—এঁরাই কবির পূর্বপুরুষ ; সুতরাং কবির ব্যুৎপত্তি বুদ্ধিতে নয়, উপলব্ধিতে ; সুতরাং কবিতা যুক্তির লালন-ব্যতিরেকেও মরে না, অভি-জ্ঞতাতেই তার জন্মগত অধিকার। কিন্তু এ-অভিজ্ঞতা মুখ্যত লেখকের নয়, পাঠকের। অর্থাৎ কাব্য যদি বিবরণের ভার নেয়, তবে তার সার্থকতা ফুরায় অবিলম্বে, কারণ তার ব্রত উদ্বোধন, পাঠকচৈতন্যের উদ্বোধন।

এইখানেই ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের প্রভেদ—ইতিহাস বহির্জগতের বর্ণনাতে সদা-সর্বদা ব্যস্ত, তা ছাড়া তার অস্তিত্ব নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ; কিন্তু কাব্য স্বাবলম্বী, তাতে কাব্যেতর বিষয়ের প্রবেশ ব্যাহত, তার প্রভাবে মানুষ কেন অভিভূত হয়ে পড়ে, তা আমরা হয়তো জানি না, তবে সে-প্রভাব যে বস্তু-বিশ্বের প্রভাবের মতোই প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নয়, সে-সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি যেমন স্বভাবগুণে মনুষের নাড়ীতে সংবেদনার স্রোত বইয়ে তাকে অভিজ্ঞতার স্বরাজ্যে পাঠায়, কাব্যও তেমনই স্বাধিকারবশে পাঠকের মনকে মাতিয়ে তোলে। অনেকের মতে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব শুধু ধ্বনির সাহায্যে। কিন্তু আমি মানি না যে কাব্যের ফলাফল শুধু শ্রুতিঘটিত ; অন্তত আমার ক্ষেত্রে কবিতার মায়া শ্রবণসুভগ তো বটেই, এমনকি তাতে আমার চোখেও লাগে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির অঞ্জন। আমার কাছে কাব্যের প্রতীক ও পৌত্তলিকতা বাহ্য অলংকার মাত্র নয় বরং অবর্জনীয় সম্পদ। ওইগুলোর জন্যেই কাব্যে ভাব রূপ পায়, অর্থ পরবশতা কাটিয়ে ওঠে, মানসী মানবীর মতো রক্তে, মাংসে, রসে, রেখায় মূর্তিপরিগ্রহ করে। কোনও অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত কারণে মহৎ কাব্যে বাক্য প্রায়ই বস্তুতে বদলায় ; এবং তার উপাদানে

এই অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে ব'লেই, তার ফল সার্বত্রিক, অথচ সকল ক্ষেত্রে সমান নয়।

বস্তুজগৎ যদি নির্বিকার হয়, তবে তার নিত্যতা নিশ্চয়ই মনুষ্যনিরপেক্ষ। লৌকিক পরিচয়ে বস্তু বিকারবহুল; এবং দুপুর রোদে যাকে কলাগাছ ব'লে বুঝি, চাঁদের আলোয় তাকেই দেখায় ভূতের মতো। তাছাড়া একই বস্তুর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন। আমার কাছে দেওদার বলাকার কাংস্য-ক্রেঙ্কারে মুখরিত, অস্তগামী সূর্যকিরণে মুকুটিত তার উড্ডীন কেশদাম, তার নিষ্কম্প্র চরণ বিধৌত ঝিলমের বন্দারু স্রোতে। কিন্তু আমার প্রতিবেশী ছুতোরকে ওই একই গাছ শোনায় শুধু লাভ-লোকসানের কথা। কাব্যের বাহন-সম্বন্ধে যখন এতখানি অনিশ্চিয় সম্ভব, তখন কবিতার - বিশেষত ছোট কবিতার মধ্যস্থতায় কোনও নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপনের আশা বিড়ম্বনা। তার চেয়ে নিজেকে ভুলে পাঠকের চৈতন্যকে জাগানোর চেষ্টাই ভালো। কারণ সে চৈতন্য কী করে জাগে, তা আমরা জানি বটে. কিন্তু জানি না কী উপায়ে তার চৈতন্যে আর আমার চৈতন্যে কম্পকম্পন চলতে পারে।

মনের সঙ্গে মনের সংসর্গ একেবারে দুর্ঘটনা না হোক, তা নিতান্ত দৈবাধীন; কিন্তু দেহের সঙ্গে দেহের সংঘাত শুধু সুসাধ্য নয়, অনিবার্যও। সুতরাং মহাকবিমাত্রেই মনোবিনিময়ের পণ্ডশ্রমে কাল কাটাতে অনিচ্ছুক, তাঁদের নিরাকার ভাবনা-বেদনার বহিরাশ্রয়-আবিষ্করণেই তাঁরা বদ্ধপরিকর, ব্যক্তিগত অনুভূতিকে একটা গ্রহণীয় বস্তুরেখার গণ্ডিতে আটকাতে পারলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। কারণ সে-উপায়ে মনস্কাম তো পোরেই, একের অভিপ্রায় অন্যের সর্বনাশ সাধে না, শুধু পাঠকের জড়িমা লেখকের আজ্ঞাতে ভাঙে। স্বকীয় অভিজ্ঞতার সীমা পাঠক যদিও আপন শক্তি অনুপাতেই মাপে. তবু অনভিজ্ঞ থাকার অধিকার তার আর থাকে না; লেখকের ইশারাই তাকে চালায়, অনুভব করায়। খৃষ্টীয় দাক্ষিণ্যবাদের ভগবানের পরিকল্পনা কতকটা এই রকমের; এবং হয়তো সেই জন্যে কোনও কোনও ভাবালু বা ভ্রান্ত দার্শনিক বলেছেন যে কাব্যরচনা সৃষ্টি-ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

বলাই বাহুল্য ও-ধরণের ভাববিলাসে আমার সহানুভূতি নেই; এবং খৃষ্টীয় বা অন্য কোনও ধর্মোক্ত ভগবান সম্বন্ধে আমি নিরুৎসুক বটে, কিন্তু বিশ্ব-বিধাতার সঙ্গে সামান্য কবির তুলনা করতে আমার অবিশ্বাসী মনও কুণ্ঠিত। তৎসত্ত্বেও আমি দাক্ষিণ্যবাদের নাম নিলুম এই আশায় যে ওই উপমা-ব্যবহারে আমার বক্তব্যের অস্পষ্টতা কাটবে। কবির আজ্ঞাবহ হয়েও পাঠক যে-পরিমাণ স্বাধীনতার সুযোগ পায়, তার সাদৃশ্য মেলে ভগবানপরিচালিত মানুষের পাপপ্রবৃত্তিতে। কবিও ভগবানের মতো পাঠককে একটা চক্রচরণের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত; এবং দৈবানুপ্রাণিত মানুষের মতোই পাঠকও এক জায়গা থেকে বেরিয়ে, আবার ফিরে আসে সেইখানেই। এইটুকু শাসন মানা ছাড়া অন্য সকল

বিষয়েই পাঠক স্বেচ্ছাচারী। ঠিক কোন্ পথে সে এগোবে, কোনখানে জিরোবে কত বার পড়বে, কখন উঠবে, এ-সমস্তই তার অভিরুচি-সাপেক্ষ। কবি চায় শুধু তার গতি, তার যাত্রারম্ভ ও যাত্রাশেষের সন্নিপাত; এবং চলতে চলতে সে যদি লক্ষ্য হারায়, তবে তাতে কবির আপত্তি নেই, যদি সে গোলকধাঁধায় পড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে, তবু কবি তাকে বাঁচাতে যাবে না, যদি সে এমন পথে গন্তব্যে পৌঁছায় যা কবির নিজেরও অগোচর, তাহলেও কবি তার বাধ সাধবে না, বরং তার কপালে জুটবে অধিকতর সম্মান।

শুধু এই দিক থেকে খৃষ্টানদের করুণাময় ভগবানের সঙ্গে কবির মিল ধরা পড়ে: অন্যত্র এরা একেবারে আলাদা, এত আলাদা যে প্রথমটি লোকোত্তর হয়েও মানুষের ছাঁচে ঢালা ব্যক্তিস্বরূপের পরম প্রতিমান, এবং দ্বিতীয়টি মর্ত্যচর হয়েও পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক। এই নির্লিপ্তির উপরে জোর দিলে, কবিকে আর ভগবানের সমগোত্রীয় ঠেকে না, বোঝা যায় তার একমাত্র উপমান বিজ্ঞানের নিয়মাবলী। তার নিয়ম সাধারণের উপরে গড়পড়তা হিসাবেই খাটে, কিন্তু তাতে পাঠকবিশেষের পুরুষকার একেবারে নিষিদ্ধ নয়, শুধু সঙ্কুচিত। তার অধীনে এসে ব্যষ্টি হিসাবে কোনও পাঠক আপনার ভাগ্যনির্বাচনের দাবি ছাড়ে না, কেবল আপন নির্বাচনক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করে। অনিশ্চয়-বিধির কল্যাণে বিদ্যুৎকণামাত্রেই যেমন গোটা-কয়েক সম্ভবপর অবস্থার যে-কোনও একটার আশ্রয়ে স্থিতি পায়, তেমনই শেক্‌স্‌পীয়র-এর প্রত্যেক পাঠক নানান মানসিক প্রতিক্রিয়ার যে-কোনও একটা স্তর বেছে নিতে পারে। কিন্তু তাড়না সত্ত্বেও অপরিবর্তিত থাকা অথবা একটা নির্দিষ্টসংখ্যক অবস্থার বাইরে যাওয়া বিদ্যুৎকণার পক্ষে যতখানি দুষ্কর, শেক্‌স্‌পীয়র প'ড়ে সিনেকা-র ধৈর্যবাদের মর্মগ্রহণ ততোধিক দুঃসাধ্য।

এই কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায় যে বিষয়নির্বাচনে কবির স্বাধীনতা যদিও অনন্ত, তবু বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে কবিতার মৌলিকতা বা সাফল্য বিজড়িত নয়। কাব্যের মুখ্য সম্বল আবেগ; এবং আমাদের আবেগসংখ্যা যেহেতু অত্যল্প, তাই প্রসঙ্গের দিক থেকে কবিতাবিশেষকে যত অপূর্বই দেখাক না কেন, ফলাফলের বিচারে তার মধ্যে একটা আনুপূর্বিকতা ধরা পড়বেই পড়বে। এই ধারাবাহিকতার অনুসরণে তথাকথিত সনাতন সত্যসমূহের সন্ধান মিলবে কিনা জানি না; কিন্তু একেই পূর্বোক্ত ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ ব'লে মানলে, নিশ্চয়ই কোনও সাংঘাতিক ভুল হবে না। এই প্রবহমাণ ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বকীয় প্রণালীর সঙ্গম-সাধনই অব্যক্তির মরুভূমিতে ফসল ফলানোর একমাত্র উপায়। ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন অতিব্যক্তি আবেগের অন্তঃপ্রবেশে রসিয়ে ওঠে, তখনই সে রত্নগর্ভা-পদবীর যোগ্য, শুধু তখন রূপের জন্ম সম্ভব।

অবশ্য কচিৎ-কদাচিৎ এক-আধজন লোক খাস কুয়োর জলেও এই অনুর্বর জমিতে চাষ-আবাদ ক'রে গিয়েছে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পরিশ্রম

পণ্ড হয়েছে, নিয়মিত শস্যাবর্তন তাদের ভাগ্যে জোটেনি ; এবং এক দিন না এক দিন অনাবৃষ্টির প্রকোপে তারা মরেছে অনাহারে। সুতরাং যে-ঐতিহ্য ব্যক্তিত্বের অনিবার্য ঊষরতা থেকে কবিকে মুক্তি দেয়, তা মানবসভ্যতারই নামান্তর, এমন ভাবলেও কোনও দোষ নেই ; মানুষের ভাবনা-বেদনার যত বিভিন্ন আকার-প্রকার যুগ-যুগান্তরের অবিরত সাধনায় পূর্ণাবয়ব পেয়েছে, উক্ত ঐতিহ্য তারই আশ্রয়। কিন্তু মানবসভ্যতা যেহেতু মানবীয় আবেগের প্রাক্তন পটভূমিতেই লীলায়িত, এবং সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা-বেদনার পরিপুষ্টি যদিও অবশ্যম্ভাবী, তবু অনুভবপ্রসূ আবেগসমূহ যেহেতু নির্বিকার ও নিত্য, তাই অনেকের মতে কবিদের উত্তরাধিকার মানুষিক চিৎপ্রকর্ষের চেয়েও পুরাতন, এত পুরাতন যে তাকে প্রায় অনাদ্যন্ত লাগে।

এই রকম কোনও একটা সুসঙ্গত অভিমতের প্রচ্ছন্ন পৃষ্ঠপোষণেই য়েট্‌স্‌ কবিকল্পিত মানস প্রতীকগুলোকে বস্তুর চেয়েও বেশী বাস্তব আর মানুষ অপেক্ষা অধিক বয়স্থ বলে ঘোষণা করেছেন। শত ইচ্ছা থাকলেও য়েট্‌স্‌-এর মতো ইন্দ্রজালে আস্থাস্থাপন আমার সাধ্যের অতীত ; এবং প্লেটো-প্রবর্তিত অতিমর্ত্য লোক আমার চক্ষে যদিও সুন্দর ঠেকে, তবু তার স্বপ্নস্বচ্ছ অসারতা আমি কোনও মতে ভুলতে পারি না। কিন্তু মনের এইরূপ মূলগত পার্থক্য নিয়েও প্রতীকের অবিনশ্বরতা-স্বীকার আমার পক্ষে শক্ত নয়। কারণ আমি প্রগতি-সম্বন্ধে নিরুৎসাহ—আমার বিশ্বাস মানুষের মতিগতি তার দেহ-পরিচ্ছেদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ; এবং এই দেহ যখন কালান্তরেও অভাবনীয় রকমে বদলায়নি, তখন মনের আদিম অবস্থাগুলো মোটের উপরে অপরিবর্তিত আছে। এই ধারণার স্বপক্ষে য়ুং-এর সাক্ষ্য প্রণিধানযোগ্য ; এবং আধুনিক চিত্তবিকারের বিশ্লেষণে নেমে তিনি বার বার দেখেছেন যে কোনও কোনও মানসিক পীড়ায় বিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-পুরুষ অন্তঃপ্রেরণায় তাগিদে এমন সব ছবি আঁকে যে সেগুলোর জোড়া খুঁজতে বিশেষজ্ঞদের যেতে হয় দু হাজার বৎসর আগেকার চৈনিক যোগীদের অঙ্কিত কুণ্ডলিনী চিত্রে।

বলাই বাহুল্য যে মতিভ্রান্তদের সঙ্গে যোগীদের উল্লেখ করে আমি যোগ-সম্বন্ধে কোনও হঠোক্তির প্রশ্রয় দিচ্ছি না যোগের বিষয়ে আমি কিছুই জানি না ; কিন্তু জনশ্রুতি যদি একেবারে অবিশ্বাস্য না হয়, তবে না মেনে উপায় নেই যে অন্তত অবধানের পরিসরসঙ্কোচে মনোরোগীও যোগীর সমকক্ষ। অন্যত্র উন্মত্ততা ও তপস্যার মধ্যে যতই ব্যবধান থাকুক, এই মনোযোগহ্রাসের দ্বারা, এই একাগ্রতার কল্যাণে, উভয় ক্ষেত্রে চিৎশক্তির ব্যাপ্তি ঘটে, এবং মানুষ বুদ্ধির দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। ফলে যোগী ব্রহ্মসাযুজ্যে পৌঁছান বা না পৌঁছান, উন্মাদেরা অবচেতনের নৈরাজ্যে নিজেদের একেবারে হারিয়ে ফেলে। আমাদের ব্যবহারিক জীবন প্রধানত বুদ্ধিচালিত, এবং সেই জন্যে যারা কর্মক্ষেত্রেও অবচেতনার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না, তাদের আমরা পাগল ভাবি।

কিন্তু বস্তুত অবচেতন বা অচেতনের উপদ্রব থেকে কোনও ব্যক্তির অব্যাহতি নেই। তবে অবচেতন যেহেতু আমাদের লজ্জাকর আকাঙ্ক্ষার অজ্ঞাতবাস, তাই জাগ্রতাবস্থায় আমাদের সামাজিক বুদ্ধি সাধ্যপক্ষে অবচেতনের সংক্রমণ বাঁচিয়ে চলে।

কিন্তু ঘুমের আবেশে কিংবা ঐকান্তিক অভিনিবেশের তন্ময়তায় আমাদের ইচ্ছাশক্তি যখন এলিয়ে পড়ে, তখন নির্নিগড় কল্পনা অথবা নিরতিশয় প্রেরণা দুর্লভের বশীকরণে বেরোয়, তখন চিন্তা চিত্রল হয়ে ওঠে, ভাব বদলায় ভাবচ্ছবিতে। এই সময়ে যে-সকল আলেখ্য মনের অন্তর্ভৌম দেশ থেকে চৈতন্যের বহিস্তলে এসে জোট পাকায়, সেগুলোতে ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের স্পর্শ লাগলেও সে-সমস্তের ধরণ-ধারণ চিরন্তন; এবং ফ্রয়েড্ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-র স্বপ্নবিশেষের বিকলন ক'রে দেখিয়েছেন যে উক্ত স্বপ্নে যে-বিগ্রহাদি লিওনার্দো-কে পেয়ে বসেছিল, সেইগুলোই মিসরের ধর্মানুষ্ঠানে প্রচলিত ছিল তিন হাজার বৎসর পূর্বে। লেওনার্দো-র স্বপ্নটি যে যৌনসম্পর্কিত সে-বিষয়ে ফ্রয়েড্ সন্দেহের অবকাশ রাখেননি; এবং মিসরী পূজা-পার্বণের মিথুনিক ভিত্তিও আজ তর্কাতীত। সুতরাং এমন সিদ্ধান্তই হয়তো সমীচীন যে কেবল আবেগ নয়, আবেগের প্রকাশভঙ্গিও দেশ, কাল ও পাত্রের অতীত; এবং সেই জন্যে অর্থাৎ প্রতীকমাত্রেই খুব সম্ভব সার্বজনীন ব'লে, মানোবিনিময় কবির সাধ্যে না কুলাক, তার বেদনা পাঠকের গোচরে আসে।

আমার কথার সমর্থনে মালার্মে প্রমুখ ফরাসী কবিদের নামও উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত প্রথায় চিন্তাসম্বন্ধ কবিতা লেখা ছেড়ে, তাঁরা যখন চিত্রপ্রধান কাব্য-রচনায় হাত দিয়েছিলেন, তখন প্রতীকের অনাত্ম স্বরূপই তাঁদের উদ্যোগকে অনর্থের কবল থেকে বাঁচিয়েছিল; এবং পক্ষপাতশূন্য সমালোচকমাত্রেই মেনে-ছিলেন যে সে-রহস্যময় কাব্যের অর্থগ্রহণ সাধারণত দুষ্কর বটে, কিন্তু তার ধাক্কায় জাগা শুধু সম্ভবপর নয়, স্বাভাবিকও। প্রতীকীরা অবশ্য যোগচর্চার ধার ধারতেন না, এবং অবচেতনার গুণ-কীর্তন সে-দিন পর্যন্ত আধুনিকতার অপরিহার্য লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু হিপ্নোসিস্-ঘটিত সম্মোহনের সঙ্গে তাঁদের অল্প-বিস্তর পরিচয় ছিল। তাঁরা জানতেন যে ছন্দের ও অতিচ্ছন্দ ধ্বনিতরঙ্গের সহায়তায় পাঠকের মনে অনুরূপ স্বপ্নাবস্থার উৎপাদন সুসাধ্য; সে-সময়ে যদি তার সামনে কোনও প্রতীক ফুটে ওঠে, তবে সে যতখানি একাগ্রভাবে সে-প্রতীকের ধ্যান করতে পারে, তা অন্য সময়ে তার ক্ষমতায় কুলায় না। এর কারণ হয়তো খুব দুর্বোধ্য নয়। জাগরণকালে আমাদের সকল ইন্দ্রিয় বাইরের অবাধ আক্রমণে অস্থির থাকে। ফলে একটার উত্তেজনা আর একটার সঙ্গে মিশে যায়, এবং আমাদের প্রতীতিগুলো হয় অস্পষ্ট ও অস্থায়ী। কিন্তু কোনও উপায়ে কতকগুলো ইন্দ্রিয়কে দাবাতে পারলে, বাহ্য জগতের প্রবর্তনা অন্তর্লোকে প্রবেশের অধিকাংশ পথই বন্ধ দেখে, যে-একটা

ছুটো দ্বার খোলা পায়, তারই সামনে ভিড় জমায়, এবং দশের প্রণোদনা একের ভোগে এসে তার গভীরতা বাড়ায়।

সুপ্তাবস্থায় দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদিতে প্রায়ই মন্দা পড়ে; তাই সে-অবস্থায় স্পর্শের প্রভাব অত বেশী; তখন ওই এক উদ্বোধকই সকল রকম উপলক্ষ যোগায়। অঙ্গহানির ফলে মানুষের কোনও একটা শক্তির যে-পরিপুষ্টি ঘটে, তার ব্যাখ্যাও বোধহয় এইখানে। যোগের সঙ্গে কাব্যের সাদৃশ্য এই ইন্দ্রিয়নিরোধব্যাপারে; এবং উভয়ের সংযমপ্রণালীতেও বোধহয় অধিক পার্থক্য নেই। উভয় প্রকরণেই পুনরাবৃত্তি অতিব্যবহৃত: প্রাণায়ামে বিধিবদ্ধ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টা যেমন চিত্তবিক্ষেপের অন্তরায়, কাব্যেও তেমনই ধ্বনি-তরঙ্গ-অনুসরণের প্রয়াস আত্মসমাহিতির সহায়; এবং উভয় ক্ষেত্রেই একনিষ্ঠা ইন্দ্রিয়বোধের বিস্তার গুটিয়ে আমাদের বহির্মুখী চৈতন্যকে চালায় অন্তর্মুখে। অবশ্য এই দুই পদ্ধতির উদ্দেশ্য আলাদা—যোগাচারে চৈতন্য শেষ পর্যন্ত সমাধির শিখরে পৌঁছায়, এবং কাব্যের সম্মোহনে চেতনা হারায় অবচেতনের নিরুদ্দেশে। তাহলেও পরমাবধি, তা সে উপরেই মিলুক অথবা নীচেই মিলুক, তার প্রকৃতি সর্বত্রই এক; ঊর্ধ্বগমনের মতো অধোগমনেও মুক্তিই আমাদের লক্ষ্য; এবং শুদ্ধ চৈতন্য আর অচৈতন্য দুই যেহেতু লোকোত্তর, তাই তাদের পদমর্যাদা নিয়ে বাদানুবাদ নিতান্ত নিষ্ফল।

আমি জানি আমার বক্তব্য যে-স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে নির্বিকল্পতার চেয়ে বিপদের সম্ভাবনাই বেশী। প্রমাণের দিক দিয়ে মনোবিজ্ঞান এখনও পদার্থবিদ্যার পর্যায়ে পৌঁছায়নি; এবং অবচেতনায় বিশ্বাস ততটা যুক্তিসাপেক্ষ নয়, যতটা আস্থাপ্রসূত। হয়তো সেই জন্যে এ-প্রবন্ধ যাঁকে উপলক্ষ ক'রে লেখা, তাঁর কাব্যাদর্শে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা স্থান পায় না। এলিয়ট্ ফ্রয়েড্-পন্থী মনোবিদ্‌দের বিদ্রূপবাণে বিঁধেছেন; এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে অবচৈতন্যের সমীকরণে তাঁর সমর্থন নেই। তাঁর বিবেচনায় এই ঐতিহ্য ইতিহাসবোধ ও ধর্মানুরক্তির যোগফল। তিনি ভাবেন যে ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না ঘটা পর্যন্ত অনুকরণ আর উদ্‌ভাবনের মধ্যে কোনও তফাৎ থাকে না। আমাদের যুগে, মানবসভ্যতার পাঁচ-সাত হাজার বৎসর যখন কেটেছে, তখন স্বকীয়তার সম্ভবপরতা স্বভাবতই যৎকিঞ্চিৎ। বিচার ক'রে দেখলে, আজকের দিনে আর আমূল নূতনের সাক্ষাৎ মিলবে না, পাওয়া যাবে শুধু পুরাতনের ধ্বংসাবশিষ্ট উপকরণে নির্মিত অধুনাতনী অট্টালিকা।

কিন্তু এখানেও স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ অত্যল্প; কারণ অট্টালিকার প্রয়োজন এত সার্বজনীন ও সর্বকালীন যে তার মুখ্য রীতিও আজ অখণ্ডনীয়। নবতর সমাবেশ ও বিন্যাস ছাড়া নূতনত্ববিলাসীর আর গতি নেই।

উপমা বদলালে, এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আবেগ, যা কাব্যের মূলধন, আমরা তার অংশভাক্ উত্তরাধিকারসূত্রে; বিনা বাক্যে সে-দানের প্রতিগ্রহই

আমাদের অবশ্যকর্তব্য; তবে আত্মবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাকে যারা সুদে খাটায়, তাদের কর্তব্যবুদ্ধি অবশ্যপ্রশংসনীয়। এই সুদ আমাদের ভাবনা-বেদনা; এবং একেই বোধহয় প্রাচীন ভারতে হৃদয় বলত। এর তটভূমিও যদিচ অবধারিত, তবু যুগ-যুগব্যাপী ভাবস্রোতের প্রবাহে এর প্রস্থ বেড়ে থাক বা না থাক, গভীরতা ক্রমশই অতলস্পর্শিতার দিকে চলেছে। এই হৃদয়ই স্বকীয়তার আশ্রয়। কারণ এর পিছনে মানুষের বংশানুক্রমিক সংস্কারমাত্রই উহ্য নেই, তার সমাজ ও রাষ্ট্র শিক্ষা ও দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, সাধনা ও সংযম, সে-সমস্তই এতে প্রতিফলিত রয়েছে। অতএব কবি তাঁর হৃদয়কে যতখানি ছড়াতে পারেন, তাঁর জাগতিক পরিমণ্ডলের যতখানি তাঁর কাব্যে ছায়া ফেলে, সেই পরিমাণেই তিনি আমাদের নমস্য, সেই পরিমাণেই তিনি মৌলিক।

দুঃখের বিষয় ব্যাপারটাকে এ-ভাবে বুঝলেও, বিশেষ-সাধারণের বিরোধ ঘোচে না; কারণ অনুভূতি এবং বেদনাব্যঞ্জনা, এ দুই ক্রিয়া সমান নয়, এদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। এ-কথা এলিয়ট্ও জানেন, এবং সমস্যাসমাধানের উপায়নির্দেশে তিনি নিরস্ত থাকেননি। এ-প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি আমার বক্তব্যের মতো জটিল ও অস্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব বেশী মতদ্বৈত নেই বলেই আমার বিশ্বাস। আমার মতো তিনিও মানেন যে একের সঙ্গে বহুর সালোক্য তখনই সম্ভব, যখন আত্মনেপদী বাক্য পরস্মৈপদে বদলায়, কর্তা কর্মে লোপ পায়, ভাব বিষয়াশ্রিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি যেখানে পরমার্থময় বিবেচনায় প্রতীকের ব্যবহার আবশ্যিক ভাবি, তিনি সেখানে ঐতিহাসিকতার খাতিরে উদ্ধার করেন প্রাচীন কবিদের উক্তি। বস্তুত এখানেও কোনও মতবিরোধ নেই, আছে কেবল প্রতীক-শব্দের ব্যাপ্তি নিয়ে তর্ক। আমি সেখানেই প্রতীক দেখি, যেখানে অনেক মিশ্র ভাব একটি ধ্যেয় মূর্তির চার দিকে দানা বাঁধে, যার অনুগ্রহে যুক্তির মধ্যস্থতা এড়িয়েও একের সংস্পর্শ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পথে অন্যের অন্তরে ছড়িয়ে পড়ে, যা আবেগের উদ্বোধনে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবে জাগে সকল মানুষেরই মানসপটে।

প্রতীকের অভিধা যদি এই রকমে বাড়ানো যায়, তবে এলিয়টি বাক্য-চৌর্যও তার এলাকায় আসতে বাধ্য। কারণ প্রতীকের সাহায্যে বেদনা যেমন নৈর্ব্যক্তিক রূপরেখায় ফুটে দুটি স্বতন্ত্র সত্তার মধ্যে অনুকম্পনের সেতু বাঁধে, তেমনই এলিয়ট্-এর মনোভাব দান্তের ভাষাকে অঙ্গীকার ক'রে আপনার সঙ্কীর্ণতা কাটায়। অতএব উদ্ধারসঙ্কুল রচনারীতি আপাততই প্রাঞ্জলতার বিরুদ্ধে, আসলে সহজতাই তার উদ্দেশ্য; এবং সেই জন্যে অমনোযোগী পাঠকের অভিশাপ কুড়িয়েও এলিয়ট্ এ-প্রত্যাশা ছাড়তে পারেন না যে বুদ্ধির দরজায় খিল লাগালেও, তাঁর কবিতার আবেদন রসিকের তদগত চিত্তে পৌঁছাবে উপলব্ধির সুড়ঙ্গ বেয়ে। বলাই বাহুল্য এ-দাবি ন্যায়সঙ্গত; অন্ততঃপক্ষে এর সঙ্গে কোল্‌রিজী কাব্যাদর্শের কোনও প্রভেদ নেই। কিন্তু মনো-

বিজ্ঞানীদের বিচারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত অভ্যাঘাত যেহেতু মানসিক উত্তেজনার পরিপন্থী, তাই প্রাক্তন আত্মীয়তা ব্যতীত কবি-পাঠকের হার্দ্য সংবাদ যত না দুর্ঘট, অবচেতনার বাইরে তাদের নির্বাক বিশ্রম্ভালাপ ততোধিক অভাবনীয়।

অবশ্য এলিয়ট্ এ-কথায় সায় দেবেন না; তিনি বলবেন যে মানুষের সাম্য আদমকৃত আদিম পাতকের দায়ভাগে। এই জন্যে তাঁর চক্ষে অ্যাগামেম্নন্ ও স্যুইনি সমগোত্রীয়, নোসিকা ও ডরিস্ সমধর্মী; এই জন্যে "ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড" এ টাইপিস্ট্ আর মসিজীবীর ব্যাভিচার এলিজাবেথ্ ও লেস্টর-এর প্রেম-কাহিনীর সঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাপের প্রকৃতিতে সকল মানুষ যেমন সমান, পরিত্রাণের উপায়েও তারা তেমনই অভিন্ন। এই উপায় অনুতাপ আর অগ্নিদীক্ষা; এবং এরই প্রচার-কল্পে ভগবান যিশুর দেহ ধ'রে মর্ত্যসংসারে এসে কাঁটার মুকুট প'রে ক্রুসে চড়েছিলেন। অতএব মানুষ যদি খৃষ্টপ্রদর্শিত পথ না ভোলে, তবে গন্তব্যের ঐক্যে তার ব্যক্তিত্বের বাধা ঘুচবে। কিন্তু এই রকম আদর্শনিষ্ঠা সকল কালেই বিরল; এবং আমাদের নাস্তিক যুগে তার চর্চা একেবারে অসাধ্য। এই কারণেই মনের বার্তাবহ হিসাবে বর্তমান সাহিত্যের অপটুতা এত শোচনীয়।

এই যুক্তির সারবত্তা যে অখৃষ্টানদের কাছে অস্বীকার্য, তাতে সন্দেহ নেই; এবং তাই প্রসঙ্গত বলা দরকার যে লাইব্‌নিৎস-এর মতো বিজ্ঞানবিদ্ দার্শনিকও মানবীয় আদান-প্রদানের ব্যাখ্যায় অনুরূপ মতবাদের শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত স্বতন্ত্র জীবকণাগুলি স্বভাবত পরস্পরবিরোধী বটে, কিন্তু তারা সকলেই ব্রহ্মপ্রসূত ও ব্রহ্মাভিমুখী; এবং বিয়োগধর্মে সেই জীবাণুরা যদিচ অত্যাধুনিক পরমাণুপুঞ্জেরই প্রতিযোগী, তবু আরম্ভ ও সমাপ্তির সাদৃশ্যবশত তাদের মধ্যে একটা পরোক্ষ সম্বন্ধ শুধু সম্ভবপর নয়, অবশ্যম্ভাবীও। এই অনুমানের পিছনে হয়তো ন্যায়ের চেয়ে নিষ্ঠাই বেশী; তাহলেও এতে কেবল খৃষ্টানী কুসংস্কারের ঘনান্ধকার দেখা অনুচিত। সকল সভ্য দেশের ধর্মানুভূতির মূলে এই অন্ধ বিশ্বাসের প্রকারান্তর মেলে; এবং ধর্মশব্দের অর্থে এলিয়ট্ মুখ্যত ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মতামতকেই বুঝলেও, উপনিষদ, বৌদ্ধধর্ম, কন্‌ফিউসিয়স্-এর উপদেশাবলী, মিসরী পূজাপদ্ধতি, এমনকি প্রাগৈতিহাসিক আচার-ব্যবহার থেকে তিনি একই মহাবাণী সংগ্রহ করেছেন।

আসল কথা বিনা আদর্শে শুধু কাব্যরচনা কেন, কোনও কার্যই সাধ্য নয়; এবং এই আদর্শের শাখা-প্রশাখা নিয়ে যদিও অনেক তর্ক আছে, তবু এর স্বরূপ-সম্বন্ধে আস্তিক-নাস্তিক সকলেই প্রায় একমত। তবে আস্তিকেরা বলে থাকেন যে এই আদর্শের সূত্রগুলি বিভিন্ন ধর্মের আপ্তবাক্যে বাসা বেঁধেছে; এবং নাস্তিকেরা ওই সকল আপ্তবাক্যের মহার্ঘ্যতা মেনে নিয়েও দাবি করেন যে উক্ত উপদেশাবলী আধিদৈবিক নয়, ওর তলায় তলায় লক্ষ লক্ষ বৎসরের জৈবিক ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। দুই দলের কোনও একটাতে কবি যোগ

দিতে পারেন ; কিন্তু একটা যেমন তেমন মূল্যজ্ঞানের আনুগত্য ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। কারণ যে-পথেই প্রতিমানে পৌঁছানো যাক, সাহিত্যে তার ফল অবিকল এক রকমের—তারই সাহায্যে স্থূল অভিজ্ঞতা সূক্ষ্ম অনুভূতির স্তরে ওঠে, তারই শাসনে আবেগ বেগ হারিয়ে আধারের বশে আসে। অভিজ্ঞতা কেবল অভিজ্ঞতা হিসাবেই স্মরণীয় বা বরণীয় নয় ; তার মধ্যে লোকে কেবল সেইটুকু মনে রাখে আর বুঝতে চায়, যেটুকু সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক।

সুতরাং উক্ত শ্রেয়োবোধ কোনও কালেই নিষেধাত্মক নয়, অথবা তাতে শুধু কূপমণ্ডুকেরা প্রশ্রয় পায় না। বরং তার পরেই নতুন অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান অনিবার্য ঠেকে, বোঝা যায় যে সাধারণ মানুষের জীবনবেদ এতদৃশ-সঙ্কীর্ণ, তার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এত অপরিসর, এমন অনেক অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সে এ-রকম অশিক্ষিত যে সাহিত্যের কল্যাণে তার অবিদ্যা না কাটলে সে নিতান্ত নিরুপায়। ফলত কবির পক্ষে শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রসাদ-বিতরণ যথেষ্ট নয়, অনেক সময়ে তিনি কাল্পনিক অভিজ্ঞতার উদ্‌ভাবনেও বাধ্য, যাতে পাঠকের দৃক্‌শক্তি বাড়ে, সে জীবনের আর্যসত্যগুলোকে স্পষ্টতর করে চেনে। অর্থাৎ উপর্যুক্ত মূল্যজ্ঞানের প্ররোচনায় কবি মাঝে মাঝে অভিনয়ে মাতেন ; এবং তখন তিনি যে ভূমিকায় নামেন, তার সঙ্গে তাঁর বা দর্শকের চাক্ষুষ পরিচয় থাকে না। কিন্তু মহানুভবতা ও নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্যের জোরে, বিশ্ববীক্ষা ও অন্তর্দর্শনের গুণে, এই অঘটনসংঘটনেও তিনি সম্ভাব্যতার সীমা ভোলেন না, কল্পনাবিলাসের মধ্যেও সত্যবত্তা বজায় রাখেন।

এলিয়ট বোধহয় ওই ধরণের কবি নন। হয়তো তাঁর কাব্য এখনও তর্কাতীত উৎকর্ষে উঠতে পারেনি ; কিন্তু তাঁর মূল্যজ্ঞান-সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আছে। যে দার্শনিকতা কাব্যের উপকরণ না হয়েও, কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাতে তিনি বিশেষ ভাবে বিত্তবান ; এবং তাঁর বিদ্যা প্রগাঢ় ও বুদ্ধি অকুতোভয়। তাঁর কাব্যাদর্শে ছিদ্র অনেক ; কিন্তু সে-আদর্শের প্রধান গুণ এই যে তাকে বা তার থেকে উৎপন্ন কবিতাকে বুঝতে গেলে, কাব্যের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে সমস্ত সমস্যার পুনরুত্থাপন অনিবার্য লাগে। এই অন্বেষণের পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতান্তর ঘোচে কিনা, সেটা গণ্য নয় ; এটাই স্মরণীয় যে তিনি আমাদের মূর্ছাগ্রস্ত বিচারবুদ্ধিকে জাগিয়ে দেন। কাব্য জীবনের সমালোচনা—আর্নল্ড্‌-এর এই বিখ্যাত মন্তব্যের প্রতিবাদে এলিয়ট্‌ যদিও অনেক হঠোক্তি-উচ্চারণ করেছেন, এবং রিচার্ডস-এর বিজ্ঞানসম্মত কাব্যার্চনায় তিনি যদিও আস্থাহীন, তবু তাঁর গদ্যে-পদ্যে যতখানি জিজ্ঞাসার সন্ধান পেয়েছি, তা আধুনিক কালে একান্ত দুর্লভ। হয়তো এই জন্যে বর্তমান ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এত পরিব্যাপ্ত, হয়তো এই জন্যে তিনি ভবিষ্যতের পূজ্য।

এলিয়ট : কাল্‌চার প্রসঙ্গে

নীহাররঞ্জন রায়

ইংরেজ লেখক একই culture কথাটি একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বস্তুত 'কাল্‌চার' কথাটার ব্যবহার নিয়ে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ইংরেজী ভাষায় এমন একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল যে টি. এস. এলিয়টের মতন কবি-মনীষীও খুব বিচলিত হয়ে পড়েন এবং ১৯৪৮-এ একখানা ছোট বই-ই লিখে ফেলেন culture কথাটার সংজ্ঞানির্ণয়োদ্দেশ্যে; বইখানার নাম Notes towards the definition of culture. বিশৃঙ্খলাটা কতদূর গড়িয়েছিল তা দেখাবার জন্য তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেন। প্রধান দৃষ্টান্তটি UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) নামক প্রতিষ্ঠানের সংবিধানের ১নং ধারা থেকে এবং বাকি দুটি ১৯৪৫-এর ৫ নভেম্বর তারিখের Times Educational Supplement-এ প্রকাশিত তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দুটি বক্তৃতার প্রতিবেদন থেকে। এই উদ্ধৃতি ক'টি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছিলেন, প্রচলিত ইংরেজি রচনায় প্রধানত দুটি অর্থে culture কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছিল। একটি অর্থ হচ্ছে আলঙ্কারিক, যাকে পাশ্চাত্য অলঙ্কারশাস্ত্রে বলা হয় synechdoche—অর্থাৎ যে অলঙ্কারে অংশ-বিশেষকে দেখানো হয় সামগ্রিক অর্থে, অথবা সমগ্রকে দেখানো হয় আংশিক অর্থে, যেমন কালচার বলতে বোঝানো হয় শিল্প বা সাহিত্যকে মাত্র। অথবা, ভদ্রতা-ভব্যতাকেই বলা হয় কাল্‌চার। দ্বিতীয় অর্থে কাল্‌চার শব্দটি ব্যবহার করা হয় কোনো ভাব-উদ্দীপনার জন্য অথবা কোনো অনুভূতিকে অসাড় করে দেবার জন্য। এলিয়টের বক্তব্য হচ্ছে, "... in general, the word is used in two ways, by a kind of Synechdoche, when the speaker has in mind one of the elements or evidence of culture such as art, or as in the passage just quoted [Article I which defines the purpose of the UNESCO] as a kind of emotional stimulant, or anaesthetic."

এলিয়টের দুর্ভাবনার অন্যতম কারণ ছিল—নিখিল য়ুরোপীয় ঐক্যের পথে কালচার-শব্দটির দ্ব্যর্থভাবনার বাধা। তাঁর আশঙ্কা ছিল, ইংরেজি ভাষাভাষী অ্যাংলিক্যান খ্রীষ্টানমহলে কাল্‌চার কথাটির ব্যবহার এক অর্থে, আর য়ুরোপের অন্যত্র ক্যাথলিকমহলে তার ব্যবহার অন্য অর্থে। এই দ্ব্যর্থভাবনা য়ুরোপীয় ঐক্যভাবনার প্রতিকূল হতে বাধ্য। তা ছাড়া এলিয়ট ছিলেন নবক্যাথলিক

ধর্মে দীক্ষিত, এবং তার পুনরভ্যুদয়ে বিশ্বাসী। এই ধর্মে কাল্চার শব্দের একটি বিশেষ অর্থ আছে এবং তা cult শব্দটির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। Cult কথাটির অর্থ পূজা: কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস। এলিয়টের ভাবনায় সে-ধর্মবিশ্বাস নব-ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মবিশ্বাস। তাঁর বৌদ্ধিক বিশ্বাস ছিল, এই cult-এর অভ্যাস ও সে অভ্যাসের প্রচলন ছাড়া যথার্থ কাল্চার গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এলিয়টের এই সংকীর্ণ অর্থ বাদ দিলেও cult বা কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস এবং সে বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনাচরণের সঙ্গে কাল্চার্-এর কোনও সম্বন্ধ একেবারে নেই, একথা জোর করে বলা চলে না।

যাই হোক, এলিয়টের শিরঃপীড়া আমার শিরঃপীড়া নয়। আমার ভাবনা, বাংলা ভাষাভাষী লোকদের নিয়ে, ভারতবর্ষ নিয়ে। কাল্চার এমন ধ্যানধারণা নয় যা আমরা য়ুরোপ থেকে আমদানি করেছি। এতৎসম্পর্কিত ধারণাটি প্রাচীন; কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অনুশীলন, চর্চা-চর্যা, এসব শব্দই তার প্রমাণ। যাই হোক, আমার প্রথম অনুসন্ধেয় হচ্ছে, এই শব্দগুলির এবং ইংরেজি culture, জার্মান kultur প্রভৃতি শব্দের সামান্যার্থ কি, গূঢ়ার্থ ই বা কি অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটির যথার্থ সংজ্ঞা কি। বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে মূলগত ঐক্য কিছু আছে কি? বস্তুত, কাল্চার বা কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রকৃতি ও চরিত্র নির্ণয় করাই আমার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য। আমার দ্বিতীয় অনুসন্ধেয় হচ্ছে, কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের সম্বন্ধ। শিল্প ও সাহিত্যের অনুশীলন মানুষকে কিভাবে কৃষ্টি বা সংস্কৃতি অর্জনে সাহায্য করে, কিভাবে তার জীবনকে নূতন অর্থসন্ধান দান করে, সমৃদ্ধতর করে তা নির্ণয় করাও কৃষ্টি বা সংস্কৃতির অর্থ নির্ণয়েরই অন্তর্গত।

একটু আগে টি. এস. এলিয়ট-কর্তৃক UNESCO-সনদের প্রথম ধারার উল্লেখ এবং সে ধারায় কাল্চার কথাটার অর্থ নিয়ে তাঁর আপত্তির কথা বলেছি। এ-সম্বন্ধে আমারও একটু বক্তব্য আছে এবং তা বলেই আমার এই প্রস্তাবনা-পর্বে ছেদ টানবো। ইংরেজি ভাষায়ও কাল্চার শব্দের কি ধরনের ঢিলেঢালা ব্যবহার হতে পারে United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization এই নামটি তার একটি পরিষ্কার দৃষ্টান্ত। ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের একটি অতি সাধারণ নিয়ম এই যে, একাধিক পদ যখন পাশাপাশি ব্যবহার করা হয় তখন একটি পদের অর্থ আর একটি পদের অর্থকে এড়িয়ে যায়, একটি আর-একটির সমার্থকতা বা আংশিক অর্থকতাও দাবি করতে পারে না। এই যুক্তি অনুযায়ী উপরোক্ত নামে education science নয়, cultureও নয়, যেমন cultureও নয় education অথবা science, scienceও নয় edncation অথবা culture, অর্থাৎ এই তিনটির ভেতর অর্থবহ কোনও যোগাযোগ নেই, একের সঙ্গে অন্যের যেন কোনও সম্পর্ক

—২

নেই। অথচ, UNESCO-উদ্যোগের কর্মকর্তাদের মনে নিশ্চয়ই তা ছিল না, বিশেষত যখন স্মরণ করি, এই UNESCO নামকরণ মনীষী জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্স্‌লির হাতে। হাক্স্‌লি নিশ্চয়ই জানতেন, শিক্ষা বা বিজ্ঞান, এ দু'এর একটিকেও কালচার থেকে আলাদা করা যায় না, বস্তুতঃ শিক্ষা ও বিজ্ঞান কাল্‌চারের অংশমাত্র, এ দু'টি না হলে কাল্‌চার সম্ভব নয়। কাল্‌চার, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এইসব শব্দ যে ধ্যান-ধারণার মূর্ত রূপ, সে ধ্যান-ধারণা জীবনের আংশিক কোনও কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের ধ্যান-ধারণা নয়; সে ধ্যান-ধারণা পরিব্যাপ্ত জীবনের সমগ্র কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের আশ্রয়ে জাত ও বর্ধিত। এ-তত্ত্বটি তুলে ধরাও আমার অন্যতম প্রস্তাব।

এলিঅটের মহাপ্রস্থান

বিষ্ণু দে

I Sometime wonder if that is what krishnameant
Among other things—or one way of putting, the same thing :
That the future is a faded Song, a Rayal Rose or lavender Spray
Of wistful regret for those who are not here to regret,
Pressed between yellow leaves of a book that has never been opened.
And the way up is the way down, the way forward is the way back.
You Cannot face it steadily, but this thing is sure,
That time is no healer ; the patient is no longer here.

—The Dry Salvages

উনিশ-কুড়ি বছরে যে কবি লিখতে পারেন শুচিবাইগ্রস্ত এলফ্রেড প্রুফ্রকের প্রেমগীতি বা এক মহিলার ছবির মতো পাকা কবিতা এবং যাঁর অদম্য পরিণতি শেষে বরন্ট্ নর্টন থেকে লিটল্ গিডিং অবধি বিশ শতকের সবচেয়ে সার্থক ইংরেজি কবিতার চতুরঙ্গে এসে দাঁড়ায়, তাঁর বিষয়ে ভাষান্তরে কিছু লেখা কঠিন। বিশেষ করে ভিন্নধর্মী আনকোরা ভাষায় এই কবিতার তীব্র সৌন্দর্য এবং এই কবি রসলোকের ক্ষুরধার যাত্রার আশ্চর্য সংগতি ও সম্পূর্ণতার পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে ব্যর্থ চেষ্টা।

আমি শুধু এলিঅটের বিষয়ে বহু বক্তব্যের একটি বলতে চাই। এলিঅটের কাব্যে যে বেদনা, যে রোমান্টিক যন্ত্রণা—সেই ভাবাশ্রিত বিশেষত্বেই এলিঅট আমাদের এত নাড়া দেন এবং সেই বেদনার আবেগেই তাঁর চিত্রকল্পগুলি হয়ে ওঠে প্রতীক। এলিঅটের প্রতিনিধিমূল্যও এই কারণে এত বেশি। এ যন্ত্রণার উৎস শেষ পর্যন্ত স্বভাবের গভীরে এক দ্বন্দ্বে, নানা অভিজ্ঞতার সমষ্টিতে নয়—খাপছাড়া অনুষঙ্গে। এলিঅটের স্বকীয় প্রতিভার রসায়নে আমাদের সমাজের এই বিচ্ছিন্নতা কাব্যরূপ পেয়েছে। তাই একালের কবিদের তাঁর কাছে ঋণস্বীকার করতে হয় বারবার। খণ্ডচৈতন্যের এমন একাগ্র উপলব্ধি ও এমন কাব্যসমৃদ্ধ রূপ এবং তার থেকে বর্ধমান নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি কাব্যজগতে এলিঅটের দান। এ-দান ভুললে এলিঅটোত্তর কাব্যের মুক্তির উৎসও ভুলতে হয়।

অখণ্ড চৈতন্যের অভাবের জন্য এলিঅটের দায়িত্ব অনেকখানি নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ক্ষমতার বাইরে। আত্মসচেতন মানস স্বকীয় দ্বিধায় খণ্ডিত সমাজে দীর্ণ হতে বাধ্য, সততা যদি থাকে। এখানে এ দ্বিধার ইতিহাস বা কারণ নির্দেশ অবান্তর। এলিঅটের শেষ বয়সের কাব্যে চৈতন্যের সন্ততি বা বিস্তার ও একতার ভাববিলাসী প্রশ্ন উঠে কিভাবে কাব্যকে রঞ্জিয়েছে, তাই সংক্ষেপে দেখা যাক।

প্রশ্নটির চঞ্চলতা, সুদূরের পিয়াসী আমাদের এই শেষ রোমান্টিককে প্রেরণা দিয়েছে ক্লাসিসিসমের দিকে; হৃদয়বেদনা তাই খুঁজেছে গির্জার সমর্থন; সমাজবোধের অভাব আত্মগোপন করতে গেছে সামন্তবাদী রাজশক্তির কল্পনায়। লক্ষণগুলি নগণ্য নয়, কারণ এলিঅট শুধু আত্মসচেতন কবি নন, যদিচ সে কীর্তিও নির্বোধ আনাড়ী কাব্যতত্ত্বের প্রচলনের জগতে প্রচণ্ড সিদ্ধি। তার চেয়ে বড় কথা, এলিঅট হচ্ছেন আত্মসচেতনতারই মহাকবি। তাঁর কাব্যের মূল বিষয়ই হচ্ছে আত্মসচেতন মানস, তার নাট্যরূপ ভিন্ন কবিতায় ভিন্ন হলেও। ইংরেজি কাব্যে তার প্রয়াস এই প্রথম—ভালেরি ও রিল্‌কে-র কথা দুটো কারণে এখানে ওঠে না! প্রথমত তাঁরা বিদেশী; দ্বিতীয়ত, ভিন্ন-ভিন্ন, ভাবে, ভালেরি বা রিল্‌কের মধ্যে যন্ত্রণা এত তীব্রতায় দানা বাঁধেনি বলেই হয়তো তাঁদের আত্মপ্রকাশ কবিত্বে প্রচ্ছন্ন। আত্মসচেতনতার সাহিত্যরূপ অবশ্য গদ্যে দেখা গেছে প্রুস্তে, জয়সে, কাফ্‌কায়, পাস্টেরনাকে, খানিকটা ভার্জিনিয়া উল্‌ফে। ইংরেজি কাব্যে কিন্তু এলিঅট অতুলনীয়; তাঁর এই আপন সত্তার মুখোমুখি কাব্যযাত্রার অমাবস্যাই আমাদের মন বিচলিত করে। শিল্প-সাহিত্যের মানসে সামাজিক কারণে বা যে কারণে হোক পূর্বোক্ত দ্বন্দ্ব অর্থহীন, যদি না এই চৈতন্যের আত্মনির্ভরতা দেখা দেয়। শিল্প সাহিত্যে বিষয়ী মনের পক্ষে দ্বন্দ্বের নিরাকরণে প্রয়োজন ঐ প্রাগাত্মচৈতন্য, অর্থনীতির মূল্যবান ছক নয়।

চৈতন্যের সন্ততি ও একতার প্রশ্নেই জড়িত কর্মজীবন, মানসিক সক্রিয়তার তাগিদ। এলিঅটের আত্মসচেতন ভারসাম্য পাবার বারম্বার চেষ্টাই আমার কথার প্রমাণ। ১৯১৭ সালেই এলিঅট বোঝেন আত্মসচেতনতার প্রকৃতি—তাঁর ভাষায়, প্যর্সনল্যাটি বা ব্যক্তিস্বরূপ এবং নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ। কারণ ব্যক্তিবাদের বন্দীযুগে নৈর্ব্যক্তিকতার জানলার পথেই ব্যক্তিস্বরূপের মুক্তি। অতঃপর অল্পবয়সেই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ—ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা। পশ্চিম ইওরোপের ঐতিহ্য এলিঅট নিজে সংগ্রহ করেছিলেন প্রচুর ও গভীর। দুর্ভাগ্যক্রমে তন্ময় পশ্চিম ইওরোপে এসে পড়ল গত মহাযুদ্ধ আর গত শান্তিপর্ব। নৈরাশ্যের পোড়োমাঠে এলিঅট দেখলেন নৈর্ব্যক্তিকতার আরো গভীরে শিকড়ের প্রয়োজন, এবং ভাবলেন তাঁর ঐতিহ্যবোধ তাঁর সহায় হবে ভাবদুর্গের মধ্যেই মৃত্তিকা সন্ধানে। এ সন্ধানের পরিণাম যে ধর্মধ্বজ হবে তাতে

আশ্চর্য কি? কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে এই মনোভাব যে-হিসাবে এবং যতখানি তাঁর কবিতার উপজীব্য যুগিয়েছে, সে-হিসাবে তা মোটেই নৈর্ব্যক্তিক নয়, ধ্রুপদীও নয়। নৈর্ব্যক্তিকতা বা ধ্রুপদী শান্তির নির্ভর সমাজ-ব্যাপী পুরাণে, যে পুরাণ মোটা একটা সমাজ-সংস্কৃতির একতায় ব্যক্তিসাধারণকে আশ্রয় দেয়। পুরাণ যে ঐতিহ্য-জ্ঞানার্জনে তৈরি করা যায় না বা পুরাণ যে কখনো ব্যক্তিগত সৃষ্টি হয় না, এ ভুল প্রাচীন রোমান্টিক কবিরা পণ্য-বিপ্লবের পরে তাঁদের উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের মর্যাদার অন্বেষণে করলেও, এলিঅট নিশ্চয় তা করেননি। অন্তত এলিঅটের পক্ষে তা করা মানায় না, শেলি বা ব্লেকের উপরে অত কঠিন সমালোচনার পরে।

পুরাণের পটভূমির খোঁজে কালোপযোগী সামাজিক পরিবর্তনে ভীরুর গন্তব্য হয়ে পড়ে ফ্যাসিস্‌মের স্নায়ুবিকারে জোর করে তৈরি সামগ্রিক একতার ছক। পাউণ্ডের মতো এলিঅট তাতে ঝোঁকেননি। তাঁর বিবেচনায় ইংরেজি গির্জার আশ্রয়ে ক্যাথলিক ঐতিহ্যের নিরাপদ দিব্যভাবের আবেদন বেশি। ব্লেক সম্বন্ধে এলিঅটের যৌবনে মন্তব্য ছিল: পুরাণাভাবে বাধ্য হয়ে এই সব কল্পনায় যদি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দৃষ্টির প্রতি,—সাধারণ বুদ্ধির উপরে, বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিকতার উপরে,—শ্রদ্ধা থাকত, তাহলে ব্লেকের উপকারই হত। মন্তব্যটি এলিঅটের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় কি?

এলিঅটের যে ঐ ব্যক্তিনিরপেক্ষ শান্তদৃষ্টির উপরে লোভ আছে সেটা স্পষ্ট। কিন্তু বিজ্ঞানে তিনি নিরুৎসাহ; বিজ্ঞান সব মানুষের মূল্য স্বীকারে আজ তৎপর বলেই কি? তিনি ফিরে চান ধর্মের মালমসলার ফর্দ, তাঁর যাদুঘরোয়া ঐতিহ্যের সামাজিক প্রাণ একদা ছিল বলেই সেই বিগত যুগের টুকিটাকিতে তিনি অশ্রুপাত করেন। ব্লেক্ এবং শেলির বেলাতে যেমন এলিঅটের ক্ষেত্রেও 'চিন্তা, আবেগ ও দৃষ্টির বিশৃঙ্খলা' শুধু কবির দায়িত্ব নয়, সেটা জড়িত 'কবির পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যেখানে কবির প্রয়োজন মেটে নি'। কবি হিসাবে এলিঅটও হয়তো 'এইসব কারণ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন'।

আমাদেরই মতো এলিঅট মানুষের ইতিহাসটা দেখতে গিয়ে থমকে গেছেন ক্যাপিট্যালিস্‌মের ব্যাপারটায়—তাঁর মতে যা 'অর্থনীতি ও যন্ত্রশিল্পে একটা খটকা মাত্র'। সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো এই খটকার ব্যাপারটার ফল হয়েছে জন্ ডিউঈ-র ভাষায়:

Compartmentalisation of occupations and interests which brings about separation of that mode of actiivity commonly called "practise" from insight, of imagination from executive doing, of significant purpose from work, of emotion from thought and doing....Those who write the anatomy of experience then suppose that these divisions inhere in the very

constitution of human nature.

তাই গীডিয়ন্ বলেছেন ভালো, যে গত শতাব্দীর দায়ভাগে মানুষের বিবিধ কর্মধারাও স্বতন্ত্র, প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের লেসে-ফেয়ার এগু লেসে-আলের মানসিক জীবনের কচঙ্গনে প্রযোজিত।

মানুষের চৈতন্যের এই খণ্ডতায় এলিঅটের যন্ত্রণা ভিউঙ্গ-ভাষ্যের অনুবর্তী। তিনি একে মানবস্বভাবের চিরাচরিত পাপপুণ্যের জালে ফেলে ঈশ্বরের অখণ্ডতার দুরূহ সন্ধানে ব্যস্ত। "অর্থনীতি ও যন্ত্রগুলোর ঐ সামান্য ব্যাপারটা," সংশোধনের অনেক বেশি সহজসাধ্য সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না করে তাই এলিঅট অসম্বদ্ধ মুহূর্তে শান্তি খোঁজেন, ফাঁকি দেন নিজেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বরূপের মতবাদে। সে ব্যর্থ চেষ্টায় যন্ত্রণা বৃদ্ধিই পায় (যন্ত্রণা বৃদ্ধিতে অবশ্য কাব্যের আবেগ আরো তীব্র হয়ে ওঠে)।

সুবিধা হচ্ছে এ ফাঁকিতে ফাঁপামানুষ ঠাসামানুষের কিছু দায়িত্ব থাকে না, কারণ মানুষের মন তো বহুধা হবেই। বহুকাল আগে তাঁর ঐতিহ্য-প্রবন্ধে (বন্ধুবর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্বগত দ্রষ্টব্য) এলিঅট লেখেন :

The point of view which I am struggling to attack is perhaps related to the metaphysical theory of the substantial unity of the soul ; for my meaning is, that the poet has not a personality to express, but a particular medium, which is only a medium and not a personality.

মীডিয়ম্ বা শিল্পপদ্ধতিকে যে কি করে শিল্পী প্রকাশ করে সে প্রশ্ন না তুলে বলা যায় যে শিল্পী, প্রকাশ নয়, ব্যবহার করে তার শিল্পপদ্ধতি—মানস ও শিল্পবস্তুর অ্যাবদ্ধ সহযোগিতার ও বাধার মধ্যে দিয়ে। মনের একতা সমগ্রতাকে এলিঅট একাকার সংমিশ্রণ বলে ভুল করেন, সে প্রশ্নও এখানে তোলা নিষ্প্রয়োজন।

শুধু স্মরণীয় যে এই রোমাঞ্চসাধনা এলিঅটের ভাষা-ব্যবহারের মাত্রাতেও দ্রষ্টব্য। জন্সনের পদাঙ্কে তিনি ন্যায়তই ধমক দিয়েছিলেন মিলটনের অপ্রাকৃত ভাষা-ব্যবহারকে। তিনি নিজে অবশ্য ভাষার ধর্ম বা প্রকৃতি অনুসারে শব্দ বাক্য ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। মিলটনের মতো অমিত্রাক্ষরের চৈনিক প্রাচীর তৈরি করার গুরুচণ্ডালী দোষ না থাকলেও কিন্তু কাল´ ফস্‌লের-এর অর্থে এলিঅটের ভাষাব্যবহারও খানিকটা অপ্রাকৃত। ধরা যাক, ইস্ট কোকর্-এ সেই জাঁকালো ছত্র যেখানে এলিঅট সেকেলে ইংরেজিতে পূর্বপুরুষের কথা বলেন কিন্তু উহ্য থাকে সমরসেটশিয়রের গণ্ডগ্রামের বর্ণনা, সপ্তদশ শতকে নাকি এলিঅটেরা ঐ গ্রাম ছেড়ে সাগরপারে যান। কিংবা আগেকার কোনো একটি কবিতা ধরা যাক—বর্ব্যাঙ্ক উইথ্-এ বায়ডেকের দেড় পৃষ্ঠার কবিতাটি ঐতিহ্যের ভাঁড়ার বললেই হয়। শেক্সপীয়রের নানা রচনা থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখের সংখ্যা

অন্তত নয়টি হবে, তাছাড়া গতিয়ে, সেন্ট্-অগাষ্টিন্, হেন্‌রি জেম্‌স্, ব্রাউনিং রসকিন্, ডন্, মার্সটন, ফোর্ড্ ও স্পেন্সর আছেন।

পেটার সম্বন্ধে এলিঅট লিখেছিলেন,

....it represents, and pater represents more positively that Coleridge of whom he wrote the words, 'that inexhaustible discontent, languor, and homesickness...the chords of which ring all through our modern literature.

সিম্‌বলিস্টদের গুরু স্থানীয় পেটারই প্রথম চর্চা করেন মুহূর্ত-মাহাত্ম্যের, হীরকদীপ্তিতে মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বলার তীব্রতার:

to give nothing but the highest quality to your moments as they pass, and simply for those moments' sake.

মুহূর্তের ক্ষণিকতাই যন্ত্রণার কারণ, মুহূর্তের এই নশ্বরতাই মহৎ কাব্যের বিষয় এলিঅটের শেষ চারটি কবিতায়:

The moments of happiness—
Not the sense of wellbeing, fruition, fulfilment, security or affection
Or even a very good dinner, but the sudden illumination—
We had the experience but missed the meaning,
And approach to the meaning restores the experience
In a different form, beyond any meaning
We can assign to happiness.

For most of us, there is only the unattended
Moment, the moment in and out of time
The distracion of it, lost in a shaft of sunlight,
The wild theme unseen, or the winter lightning,
Or the waterfall or music heard so deeply
That it is not heard at all, but you are the music
While the music lasts.

এই সব সুখের মুহূর্তগুলি—পাতার আড়ালে শিশুর দল, হাস্যরত, সূর্যের রশ্মিপাতে হঠাৎ উচ্ছল বা নিরুদ্দেশ; শুষ্ক সরোবরের শানে রৌদ্রের ছটা; গোলাপ-বাগানের কুঞ্জগুলি; ছবিতে, এখনই এখানে, এখনই, চিরকাল—এই সব মুহূর্তগুলি বারবার ঘুরে-ফিরে আসে চারটি কবিতাতেই এবং পরিবারের পুনর্মিলন নামক নাটকে। এই মুহূর্তগুলিই কি দি স্প্রিং অব্ দি টারনিং ওয়ার্ল্ড?

ঘূর্ণায়মান বিশ্বের স্থিরকেন্দ্রে দোলকযন্ত্রের প্রতীকটি এলিঅটের কাব্যে কোরিওলান্ যাবৎ দ্রষ্টব্য। প্রতীকটি তাঁর বহু গভীর কাব্যাংশের কেন্দ্র। মনে হয় এই পরিবর্তমান বিশ্বের স্থিরবিন্দুটি দেয়ার হোয়্যার দি ড্যান্স ইজ্, যে নাচে বিশ্বজন মোহিছে, সে নাচের গতিতে নেই, যতোটা আছে ঐ সব নিছক মুহূর্তে, আছে শৈশবের অমর স্মৃতিতে। অর্বাচীন রোমান্টিক ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের মতো, প্রবীণ ধ্রুপদী এলিঅটও গান করেন শিশুমনের নিরালম্ব শুদ্ধতায়:

(Issues from the hand of God, the simple soul (Animula)

ঈশ্বরের হাত থেকে বাহিরিয়া সরল হৃদয় যদি বিজ্ঞানে চেষ্টা না করে 'পরিবর্তমান সদা আকারে ও বর্ণে চির জড় এ পৃথিবী' নিয়ন্ত্রিত করতে, তাহলে পেটারের মুহূর্তসাধনা ছাড়া উপায় কি? বা ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের শৈশবের অমরতাবাহক সংবাদ ছাড়া? কারণ শিশু স্বভাবতই আত্মসচেতনতায় বিধুর নয়। কিন্তু ঐ নাচের প্রতীক?

প্রত্যক্ষ জীবনের অবসাদ ও বুদ্ধিগত পরোক্ষতত্ত্বের প্রাণবত্তায় চিন্তিত ভালেরি এই নাচের প্রতীক টেনেছেন তাঁর স্থপতি য়ুপালিনস্—মন ও নৃত্যের বিষয়ে নামক সক্রাটিক আলাপে। ভালেরির যুক্তি এলিঅটের চেয়ে বেশি সম্পূর্ণ, সাধ ও সিদ্ধান্ত-সংগত। দীর্ঘ এক আলোচনায় চিকিৎসার বাইরে এই জীবনাবসাদরোগ ক্ষণিক আরাম পেল শিল্পের স্বাধীন সত্তার স্পর্শে, আতিক্তের নাচের পরোক্ষ মুক্তিতে; এবং সক্রাটিস্ বলে ওঠেন:

হে অগ্নিশিখা।....
মেয়েটি আসলে হয়তো মস্তিষ্কহীন? ...
হে অগ্নিশিখা! ...
কে জানে ওর অতিসাধারণ মনটা কত কুসংস্কারে
আর কত খামখেয়ালে বোঝাই?....
হে অগ্নিশিখা, চির নিবাতনিষ্কম্প্র। প্রাণময় আর দেবতুল্য! ...
এই অগ্নিশিখা, এ আর কি, বন্ধুগণ। যদি না এ হয় সাক্ষাৎ মুহূর্তটিই? ...

এলিঅট কিন্তু ঐ অবসাদ-সীমা ছাড়িয়ে নাচটাকে একেবারে এবস্ট্রাকশন্ বা পরোক্ষতত্ত্বভাবে দেখেন না, নর্তককেও দেখেন না। অথচ নৃত্যের বিষয়ানুগ নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর মতো মহাকবিকে কাব্যবিষয় যোগাতে পারত। চিত্রকল্পটি সরল ও দ্বৈত—এক হচ্ছে দর্শক দূরে থেকে বসে দেখে এবং নর্তকদের খণ্ডগতির সমষ্টিতে উপলব্ধ হয় নাচটার রূপ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কবিও নৃত্যের মধ্যে সক্রিয়, নৃত্যের কেন্দ্র ঘিরে ঘুরে-ঘুরে এদিকে-ওদিকে সংলগ্ন নর্তকরা যেখানে নৃত্যকে মূর্তি দিচ্ছে। নৃত্যের খণ্ডিত কিন্তু সক্রিয় উপলব্ধিতে আসে নৃত্যের পরোক্ষ রূপটি, স্থানে কালে সমগ্রে ও খণ্ডের সংলগ্নতায়। এখানে দর্শকের

ব্যক্তিগত বিষয় চিন্তাবলীতে উপলব্ধির আরম্ভ নয়। অংশের ক্রমিকতায় নয়, নর্তকের স্বাতন্ত্র্যে নয়, সারা নৃত্যে সক্রিয় উপলব্ধি একাগ্র। আমার প্রতীকটা স্থূল হল, কিন্তু এলিঅটের লেখনীতে এ প্রতীকের কাব্যোৎসারে বিশ্ব ও ব্যক্তি, বিষয় ও বিষয়ীর চৈতন্যকৈবল্য কি মর্মস্পর্শী রূপ নিতে পারে তা কল্পনীয়।

শেষ কবিতাগুলিতে এলিঅট এ প্রতীকের খুবই কাছাকাছি আসেন। তাঁর অম্বিষ্ট—বিষয়সর্বস্ব বা বিষয়বিষয়ীর দ্বন্দ্বাতীত স্থিরবিন্দুটি, স্থিতি যাঁর গতির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন চিৎপদ্মের মধ্যমণিতে। বিষয়লগ্ন এই দৃষ্টি সম্ভব সক্রিয়চক্রের মধ্যে অস্তিত্বস্বীকারেই, উপর থেকে আবছা দেখায় বা পাশ থেকে তির্যক দৃষ্টির ছবিতে দ্রষ্টাদৃশ্যের মীমাংসা ঘটে না। এবং এই চক্রবৎ পরিবর্তন তো জীবনেরই গতি, যার পরিধির পারে শুধু মৃত্যুরই নেতি নেতি। তাই মৃত্যুর জীবন্ত ছলা—মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দর্শকের স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু এ স্বাধীনতায় নৃত্যের রূপায়ণ ব্যাহতই হয়, স্থিরবিন্দুটি হয় অস্থির। ঘূর্ণায়মান বিশ্বের স্থিরবিন্দুর এ প্রতিবাদে, মানছি, অশান্ত হৃদয় অনেক চমৎকার কল্পনা ছিটিয়ে বেড়ায়,—অনেক নরকল্প দেবদেবী, কাল্পনিক আয়রল্যাণ্ডের মৃত পুরাণ, অনেক তন্ত্রমন্ত্রের কুহক।—ইয়েটসের মতো।

এলিঅট তাই অনিবার্যকারণে বিজ্ঞানবিদ্বেষী, মানবচৈতন্যের সমগ্রতা তাঁর কল্পনায় নেই, জড়প্রকৃতি বা সমাজে সম্ভব যে মানুষের নিয়ন্ত্রণ তা তিনি মানেন না। তাঁর স্বর পণ্যবিপ্লবের দ্বিধাদীর্ণ বেদনার—হোয়াট ম্যান হ্যাজমেড অব ম্যান। মানুষের মনের ভাঙন মর্ত্যলোকে চিরস্থায়ী, কারণ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' কিঞ্চিৎ সুখসুবিধাও আছে। সুতরাং—

And hear upon the sodden floor
Below, the boarhound and the boar
Pursue their pattern as before
But reconciled among the stars.

অমানুষিক ঐ নক্ষত্রস্বর্গ আমাদের দায়িত্বের নাগালে নয়, অতএব কর্মফলহীন কর্মে কিবা লাভ? শিকার-শিকারীর প্রকৃতি নশ্বর জীবনের চিরাচরিত, তার থেকে আসে মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তার গভীর আবেদন।

এলিঅট অবশ্যই সাম্রাজ্যের স্তম্ভ নন, তবু তিনিও যে দায়িত্বহীন ব্যক্তিস্বরূপের মতবাদ খাড়া করে ইটন-হ্যারোর ব্যক্তিমাহাত্ম্য গান করবেন এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আর সমাজপারিপার্শ্বিকের প্রভাব ও সংস্কৃতির প্যাটার্নস মানবেন না, তাতে সাম্রাজ্যের পাপই প্রমাণিত। সেই পাপেই জড়প্রকৃতি বা পশুপ্রকৃতির সঙ্গে মানবস্বভাবকে এক করা ইতিহাসের চোখে মার্জনীয়, ঈশ্বরের চোখে নারকীয় ভ্রান্তি। কিন্তু আমার মন্তব্যের স্থানে এলিঅটের আশ্চর্য কবিতা উদ্ধৃত করাই বাঞ্ছনীয়।

At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless ;
Neither from nor towards ; at the still point, there the dance is,
But neither arrest nor movement, And do not call it fixity.
Where past and future are gathered, Neither movement from nor towards,
Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance.
I can only say, there we have been : but I cannot say where.
And I cannot say, how long, for that is to place it in time.

অতুলনীয় এ-কবিত্বে শ্রদ্ধা স্বতঃই অসীমে পৌঁছায় ; ভাবি এবারে বুঝি আইন্‌স্টাইন্‌-প্লাঙ্কের জগৎ, আধুনিক জীববিত্থার মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞা কাব্যের গভীর রূপ পেল। কিন্তু এ পরিগ্রহণ সাময়িক, এলিঅটের দ্বন্দ্ব যে নিরাকৃত হয় নি তার প্রমাণ ভিন্নস্তরের অভিজ্ঞতার ব্যর্থ মধ্যপদলোপী সন্ধি-চেষ্টায়। গতি ও আপেক্ষিকতা এবং স্থিতিকেন্দ্র অস্বীকারের ব্যথিত ভিত্তিতে, ব্যক্তির চৈতন্যের কম্পিত তাঁর দ্বিধা :

I said to my soul, be still ; and let the dark come upon you
Which shall be the darkness of God. As, in a theatre,
The lights are extinguished, for the scene to be changed
With a hollow rumble of wings, with a movement of darkness on darkness,
And we know that the hills and the trees, the distant panorama
And the bold imposing facade are all being rolled away—
Or as, when an under-ground train, in the tube, stops too long between stations.
And the conversation rises and slowly fades into silence
And you see behind every face mental emptiness deepen
Leaving only the growing terror of nothing to think about ;
Or when, under ether, the mind is conscious but conscious of nothing
I said to my soul : be still, and wait without hope

For hope would be hope for the wrong thing ;
wait without love
For love would be love of the wrong thing ; there is
yet faith.
But the faith and the love and the hope are all in the
waiting ;
Wait without thought, for you are not ready for thought ;
So the darkness shall be the light, and the stillness
the dancing.
Whisper of running streams, and winter lightning,
The wild theme unseen. and the wild strawberry,
The laughter in the garden, echoed ecstasy
Not lost, but requiring, pointing to the agony
Of death and birth.

মর্মভেদী এ কাব্যের পরে নতমস্তকে জানাতে হয় বিচলিত হৃদয়ের সম্ভ্রম। কিন্তু ধার্মিক মরমিয়ার একি মহাশূন্য ? মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সম্পূর্ণ জীবনের শেষে জীবন্মৃত্যুর ছলার দৃপ্ত স্বীকার বা পূরবীর ঐশ্বর্যের কথা—শূন্যতার অগ্নিবাষ্পে ভরা।

এ স্থির মহাশূন্যের সমস্যাই আরো সহজবোধ্য নাট্যরূপ পেয়েছে ফ্যামিলি রিয়ুনিঅন্‌এ। বুড়ো লেডী মন্‌চেন্‌সে এমির অতীতের শোকে নাটকের আরম্ভ :

O Sun that was once so warm
O Light, that was taken for granted
When I was young and strong and sun and light
unsought for—

স্থূলবুদ্ধি আইভি বলে : আমি হলে সূর্যের পিছনে ছুটতুম, সূর্যের আশায় থাকতুম নাকো বসে। চার্লস্‌ বলে : এমি আমাদের বনেদী ধরনে চিরটা কাল ঘোড়া ও কুকুর বন্দুক নিয়ে কাটিয়ে শেষে ইংলণ্ড ছেড়ে কোথায় কাটাবে শীত। এমির দিন কাটে উইশউড্‌ প্রাসাদে ছেলের প্রতীক্ষায়। লর্ড হ্যারি আট বছর ধরে সারা পৃথিবী ঘুরছে এক বাক্সে বউ নিয়ে। এগাথা বলে : তার প্রত্যাবর্তন নিশ্চয়ই হবে যন্ত্রণাকর,

I mean painful, because everything is irrevocable,
Because the past is irremediable,
Because the future can only be built
Upon the real past…

He will find a new Wishwood. Adaptation is hard.

এমি বলে : কিছুই তো পরিবর্তন হয় নি। এগাথা উত্তর দেয় : আমি বলছি যে উইশ্‌উডে হ্যারি দেখবে আরেক হ্যারিকে। যে মানুষ ফিরবে সে দেখবে সেই ছেলেটিকে যে যাত্রায় বেরিয়েছিল। ইতিমধ্যে হ্যারি জাহাজ থেকে তার নির্বোধ স্ত্রীকে সাগরতলে পাঠিয়ে ফিরে এল। একা, তার পিছনে পিছনে গ্রীক গল্পের বিবেকরূপিণী চণ্ডভগিনীরা প্রতিশোধের খোঁজে ছুটছে, ফিরে এল বয়নুট নটনের মতো উইশ্‌উডের জমিদার-বাড়িতে। হ্যারি দেখল সেই সব চেনা মানুষ, যারা আত্মসচেতন, যাদের মনের তীরে ঘটনার ঢেউ বৃথাই আছড়ে আছড়ে পড়েছে, আর সে নিজের মনের বালাই নিয়ে অস্থির।

হ্যারি বলে তার নিঃসঙ্গতার কথা, ভিড়ের মধ্যে একাকিত্বের বুকচাপা ভার, তার স্ত্রীর মৃত্যুর কথা, নিজের যন্ত্রণা। ছোট মাসি এগাথা সান্ত্বনা দেয় আর বলে :

There is more to understand, hold fast to that
As the way to freedom.

যা আবশ্যিক, তার সীমা স্বীকারেই তো মুক্তি। এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হ্যারি বলে : মনে হয় বুঝি তোমার মানেটা, অস্পষ্টভাবে—সেই যেমন তুমি বুঝিয়েছিলে চিমনিতে কান্নাটা বা অন্ধকার ঘরে সেই মন্দটার ভয়।

মেরি-র সঙ্গে ছেলেবেলার স্মৃতির আলাপের পরে হ্যারি বুঝতে পারে স্মৃতিজীবী বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের ভ্রান্তি

The instinct to return to the point of departure
And start again as if nothing had happend
Isn't that all folly ?

নাটকে এলিঅট কিভাবে তাঁর মোট প্রশ্নগুলি তোলেন এবং নিজেই জবাব খোঁজেন, সেটা লক্ষ্য করবার বিষয়। কিন্তু চণ্ডিকাদের সামনে হ্যারি আবার ভয়ে আঁকড়ে ধরে বহুধা ব্যক্তিত্বরূপের অছিলা : আমি যখন তাকে (স্ত্রীকে) জানতুম, সে আমি আর এ আমি এক নয়। (চেম্বরলেন-সরকারের দায়িত্ব আর চার্চিল্ সরকারকে ভুগতে হবে না।) এগাথা বৃথাই বলে যায় যে শাস্তি এড়িয়ে অপরাধের দায়িত্ব এড়ানো যায় না :

That there is always more : We cannot rest in being
The impatient spectators of, malice or stupidity.
We must try to penetrate .ne other private worlds
Of makebelieve and fear. To rest in our suffering
Is evasion of suffering. We must learn to suffer more.

প্রায় মার্কীয় প্রজ্ঞার এ আভাসে শেষটা অবশ্য হ্যারি চণ্ডিকাদের বহির্বিষয় করতে সক্ষম হল এবং পেল মনের মুক্তি :

This time you are real, this time you are outside me
And just endurable.

এখানে হ্যারির যে ব্যাখ্যা তার বাপমায়ের অপরিতৃপ্ত প্রেমের, সে বিষয়ে একটা কথা বলা যায়—দেয়ার ওয়াজ নো এক্স্‌ট্যাসি। তাই কি এলিঅটের সারা কাব্যে শুধু প্রেমের ক্লান্তি ও বীভৎসতা—দি বোয়্ড্‌ম, দি হরর্‌-ই আছে, প্রেমের আনন্দ, দি গ্লোরি শেষ ভাং এণ্ড ডেথ্‌-এ? এত বড় কবির কাব্য-সংগ্রহে মাত্র দুটি কবিতায় প্রেমের বিষয়ে এলিঅট একটু সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন—লা ফিল্লিয়া কে পিয়ান্‌জে এবং দি ওএস্টল্যাণ্ডের প্রথম অংশে। তাও সেখানে কবির বিষয় রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রেমের চঞ্চলতা, পিয়াস, প্রেমের সম্পূর্ণতা নয়। বোধ হয় প্রেম দুই ব্যক্তির দ্বৈতে একটি চলিষ্ণু সম্বন্ধ বলে তাতে মুহূর্তবিলাসী দেখেন শুধু ক্ষণিক সক্রিয়তার অনাচার।

গীতা এলিঅটকে তাঁর কাব্যের চমৎকার রসদ যুগিয়েছে, তাই গীতার ভাষাতেই বলা যায় যে কর্মেন্দ্রিয় নিবৃত্ত রেখে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমূহে মনে মনে বাস করে, সে উদ্‌ভ্রান্ত জন কপটাচার করে। বলাই বাহুল্য, কাব্য আচরণ নয়, কাব্য হচ্ছে মনের অন্তরঙ্গ উদ্বেলতার বহির্বিষয়ে অঙ্গীকার, কাজেই কপটতা নয়, উদ্‌ভ্রান্তিই এখানে দ্রষ্টব্য। এই উদ্‌ভ্রান্তি ছাড়া এলিঅটের একাধারে আশ্চর্য সুকুমার প্রজ্ঞান্বেষণ এবং মৃত্যুর উপরে ভয়ানক ঝোঁক মেলানো যায় না। ক্ষুধা নয়, রোগ নয়, প্রেম নয়, ঝগড়া নয়, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ নয়, কারণ এসবই মানুষের সক্রিয় সাধ্যের ভিতরে, শুধু বিষ্ঠা আর মৃত্যু। মৃত্যু যে স্বাভাবিক, এবং স্বাভাবিক নিয়ে শোক করা যে নির্বুদ্ধিতা, সে অবশ্যই এলিঅট জানেন তবু কেন এত ঝোঁক? 'প্রাজ্ঞ কখনো বিচলিত হন না জীবিত বা মৃতের জন্য।' এলিঅটের মুখ্য বিষয় নিশ্চয়ই আত্মসচেতনতার সমস্যা, আত্মসচেতন ও কর্মের আপাত দ্বন্দ্ব,—কর্মফল নয়,—কর্মের আর আত্মসচেতন মনের সংগতির সন্ধান, বিচ্ছিন্ন জীবনের পুরুষার্থে ঐক্যের সমস্যা।

নিশ্চয়ই থিয়েটারসভার নিষ্কর্ম ঐ অন্ধকার নয়। কারণ, কৃষ্ণ উবাচ যে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেও কর্মের দায় এড়ানো যায় না; প্রকৃতিজাত কারণে জীবমাত্রেই প্রতিমুহূর্তে কর্মস্রোতে চলিষ্ণু; কর্মের স্বাধীনতা কর্মের মধ্যেই, সকল কর্মের সমগ্রতায়, হে পার্থ, জ্ঞানের উৎস। আগুন যেমন জ্বলতে-জ্বলতে ইন্ধনকে করে দেয় ছাই, জ্ঞানের অগ্নি তেমনি জ্বলে কর্মের জ্বলার মধ্যেই।

কিন্তু হৃদয় যদি মানে না মানা, যদি মুহূর্তেই বসে থাকে অনড় জড়পদার্থবৎ? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যদি সোনার হরিণের মায়ায় ডাকে? সে বাসনার পরিণাম রাগে, কারণ এ পিয়াসী মন বৈজ্ঞানিকোচিত নৈর্ব্যক্তিকতায় ভেবে দেখে না কেন মুহূর্তের বাসনা চিরস্থায়ী বস্তু হতে পারে না, তাই হয় নিরাশ ক্রুদ্ধ। ক্রোধ থেকে আসে ভ্রান্তি, কৃষ্ণ বলেন, ভ্রান্তি থেকে উচ্ছৃঙ্খল স্মৃতির দৌরাত্ম্য, প্রতীকোৎসারী স্মৃতির যন্ত্রণা। যতই বিশৃঙ্খলা, যতই যন্ত্রণা, ততই জীবনে

অসহিষ্ণুতা—বাসনাসংকুল এই যে জীবন অসম্বদ্ধ, সামাজিক সমর্থনহীন, একক আত্মজ্ঞানের দ্বন্দ্বে স্মৃতিমুখর। আর দুর্মর এই স্মৃতি।

আমার বিশ্বাস এলিঅট এই ভাবগুলিই নাট্যকাব্যে রূপায়িত করেছেন তাঁর প্যায়্‌সোনা (রূপায়ণে শিল্পীর নাট্যরূপ বা মুখোশ) সুচিন্তিত, তিনি নিজে নন, তোমার-আমার মতো সাধারণ লোকই হচ্ছে নাট্যপাত্র বাদবিসম্বাদে উদ্‌ভ্রান্ত। তাই তিনি বলতে পারেন যে মুক্তির পথ শূন্যের পথ, মালার্মের নেতির মতো। ধর্মসাধকেরা অধ্যাত্মউপলব্ধির এ বর্ণনা মানেন না, এলিঅটের মতো সাধক নিশ্চয়ই, সে বর্ণনা করতে চান নি। এ শূন্য বোধ হয় শুধু যন্ত্রণার সুর নিখাদে চড়িয়ে দেবার কৌশল।

এলিঅটের এই সমস্যা। বিজ্ঞানবিরোধী, তিনি গতিশীল জীবনে কোনো ডায়ালেক্‌টিক্‌সের হাল ধরতে পারেন না। সমস্যাটা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। টমাস্‌ ব্রাউন্‌ এই সমস্যার শিং ধরে সমাধান করেন নিজের মতো, ধর্মে তাঁর বিশ্বাস নেতিবাচক ছিল না, বিজ্ঞানেও ছিল আস্থা; তিনি ভিন্ন স্বতন্ত্র ন্যায়বিশ্বের মতবাদে সমাধান খুঁজে পান যাতে অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞান দুইই বিশ্বাস্য। মন্‌টেনের সমাধানও প্রায় এইরকম যদিচ তাতে জিজ্ঞাসার ভাগটাই বেশি। মিলটন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরই একচেটে ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁর ঈশ্বর প্রায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির রূপক বললেই হয়। বেকন তো বৈজ্ঞানিক। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরায় সেকালে ডনের কান্নাটা খুব করুণ—এণ্ড নিউ ফিলসফি কল্‌স্‌ অল্‌ ইন্‌ ডাউট। এলিঅটের অবস্থা প্রায় ডনের মতো; মনের গঠনে নেই অধ্যাত্মজীবীর ঐশ্বর্য, তবু তিনি ধর্মবাদী স্থায়ী বন্দোবস্তের মরিয়া ভক্ত। তাই এ বিচ্ছেদের, ভেদাভেদের গান। কৃষ্ণ ব্যাপারটা জানলে হয়তো বলতেন, যে জ্ঞানে সর্বজীবের বিবিধ জীবনধারা বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত, সে জ্ঞান বাসনাদুষ্ট।

বলাই বাহুল্য গীতার অপব্যবহারে আমার কিছুমাত্র আর্যোচিত আপত্তি নেই। এলিঅট নিজেই তো সেনেকা প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কি করে, অজ্ঞানে বা অল্পজ্ঞানের ভিত্তিতে মহৎকাব্য রচিত হতে পারে। দি ড্রাই স্যাল্‌ভেজেস্‌-এর জমকালো গীতাব্যবহারে আমার কাব্যাস্বাদ পরিতৃপ্ত; আর পাণ্ডিত্য না থাকায়, পাণ্ডিত্যাভিমান সংযত করার প্রশ্নই ওঠে না। আমার মতে দি ড্রাই স্যাল্‌ভেজেস্‌ই কবিতাচতুষ্টয়ের মধ্যে সবচেয়ে আঁটসাঁট কবিতা। লিটল গিডিং-এর দাম্ভেশোভন ভাস্কর্য ও গাম্ভীর্য সত্ত্বেও এই শেষ কবিতাটি এক হিসাবে প্রত্যাবর্তন। এখানে এলিঅট শেষ করেছেন এয়র-রেড রাত্রির জাঁকালো বর্ণনার পরে নটিংহ্যামের রয়্যালিস্ট চ্যাপেলে প্রথম চার্লসের নৈশাভিযানে যখন গৃহ বা অন্তর্যুদ্ধে রয়্যালিস্টরা হেরে গেল। অবিসম্বাদী কবিত্বে এলিঅট আর্তনাদ করেছেন পার্টিরাজনীতির নশ্বরতায়। মৃত্যুতে, কালস্রোতে রয়্যালিস্টও শূন্যে বিলীয়মান, কি হবে কিছু ক'রে, ল'ড়ে; তাই হায় হায়।

আমি শেষ করি তৃতীয় কবিতার আশাপ্রদ শেষ ছত্রে :

We content at the last
If our temporal reversion nourish
(Not too far from the yew tree)
The life of significant soil.

প্রুফ্রকের আত্মসচেতন নিষ্ক্রিয় কৈশোর থেকে এ কবি-পরিণতির দীর্ঘ মহাপ্রস্থান নমস্ত কীর্তি তার করুণ রাজনীতিসত্ত্বেও।

টি এস এলিয়ট ঃ এক পরিপূর্ণ শিল্পী

তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি ডব্লিউ. এচ. অডেন লিখেছিলেন : তরুণ কবিরা তাঁদের কাছ থেকেই সবচেয়ে ভাল শিখতে পারেন যাঁদের বিষয়ে তাঁদের কোনও ভয় নেই; তাঁদের কাছ থেকেই যাঁরা তাঁদের সমালোচনার যোগ্য। সেই নিরিখে টি. এস. এলিয়ট মোটেই সুবিধেজনক কোনও আদর্শ নন। তাঁর বিকাশ প্রত্যেকটি স্তরেই এত সম্পূর্ণ এবং তাঁর সৃষ্টির খনিগুলি তিনি এমন পুরোপুরি ভাবে ব্যবহার করেছেন যে অপরিণত এবং তরুণ যশপ্রার্থীদের পক্ষে তাঁর আদর্শ সামনে রেখে সাহিত্য কীর্তির পথে অগ্রসর হওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। তবু এলিয়টের অনুকরণকারীদের সংখ্যা অল্প নয়, বরং পীড়াদায়ক ভাবে বেশী। কিন্তু তাঁদের প্রাপ্তি উল্লেখযোগ্য কিছু নয় এবং অনুকরণের চিহ্নগুলি তাঁদের লেখার শরীরে স্পষ্ট প্রতীয়মান।

আসলে এলিয়ট তাঁর তরুণ শিষ্যদের মনে এক ভয়ের সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন —এ ভয় হ'ল প্রকাশ করার ভয়, শব্দ ব্যবহারের ভয়। এলিয়টের উদাহরণ সামনে থাকার জন্যে এইসব বালখিল্য কাগজে কলম ছোঁয়ানোর আগে একবার বা দুবার নয় অন্তত বিশপঁচিশবার ভেবেছেন এবং তারপরেও তাঁদের কলম কথা কয়েছে অস্ফুটে, কখনও উচ্চকিত ভাবে নয়, এবং সংক্ষেপে, কেননা দীর্ঘ অবতারণায় চ্যুতির সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

স্টিফেন স্পেণ্ডার তাঁর "প্রুফ্রক" এর বিশ্লেষণে বলেছেন যে এলিয়টের প্রকরণের সার্থক অনুকরণ অসম্ভব এই কারণে যে ঐ তরল ও অনিশ্চয় গঠন শৈলী শুধু এলিয়টের নিজের উদ্দেশ্য সাধনেরই উপযোগী, অন্যদের নয়। অর্থাৎ তাঁর বলবার কথাটা যে ধরণে এলিয়ট বলেন, অন্যদের বক্তব্য সেই ধরণে বলতে যাওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। স্পেণ্ডারের এই সিদ্ধান্তে কতকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এর চেয়ে বড়ো কথা বোধহয় এই যে তাঁর কাব্যের গড়নের যে ডৌল এলিয়ট বিভিন্ন স্তরে নির্মান করেছেন তা এত নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ যে সাধারণ ক্ষমতার অধিকারীদের পক্ষে তার অক্ষম নকলনবিশী ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয়। স্পেনসারের স্তবক নির্মাণের কৌশল এবং পোপ এর হিরোয়িক দ্বিপদার যে স্থাপত্যসম্ভাবনা তা তাঁদের পরবর্তী অন্য কবিরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে বোধহয় হাস্যকর অনুকরণের বেশী কিছু ঘটেনি। কারণ ঐ দুই কবি তাঁদের সৃষ্ট কৃত্‌কৌশলের সমস্ত সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন, নতুনতর প্রয়োগের কোনও অবকাশ রেখে যাননি। এলিয়ট সম্বন্ধেও একই কথা।

একজন কবির পক্ষে আত্মসচেতনতার চরমে যাওয়া সম্ভব। এলিয়ট কিন্তু কখনও চরম আত্মসচেতন কোনও ভঙ্গী গ্রহণ করেন নি। যে কবি শুধু নিজের অনুভূতির তীব্রতায় আচ্ছন্ন এবং যিনি প্রকরণের কথা না ভেবে শুধু তাঁর মনে উপজিত কোনও উপলব্ধিকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে চান, তিনি আত্ম-প্রকাশের ভয়াবহ তারল্যকে প্রশ্রয় দেন মাত্র, যথার্থ 'কবিতা' লেখেন না। এলিয়ট 'কবিতা' লিখেছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিকে কেমন করে এবং কার বা কাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, সেটা তাঁর খুব ভাল করে জানা ছিল। তিনি শুধু কাব্য লেখেন নি, কাব্যনাটক অথবা নাট্যকাব্যও লিখেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অনুভবের উৎস ব্যক্তিগত, কিন্তু তার প্রকাশ নৈর্ব্যক্তিক এবং প্রতিনিধিত্ব মূলক। কোলরিজ তাঁর বায়োগ্রাফিয়া লিটারারিয়া গ্রন্থে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগ ও সুচিন্তিত ইচ্ছাশক্তির যে পরস্পরভেদী চলাচলের কথা লিখেছেন তার মূর্ত চিত্রণ কবি এলিয়টের নিজের সৃষ্টিতে এবং কাব্যভাবনায়।

যে কোনও একটি ইংরেজী কবিতার সঙ্কলন গ্রন্থ হাতে তুলে নিলে দেখা যাবে যে ঐ গ্রন্থের দুটি সাধারণ (নিম্নমানের ?) কবিতার মধ্যে বেছে নেওয়ার মত কিছু নেই : দুটিই সমান ভাল (খারাপ ?)। (আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয়েও এই ধরণের মন্তব্য করা সমীচীন হবে কিনা জানিনা, আমি ভয় পাচ্ছি।) কিন্তু এটা ঠিক যে সাধারণ মাপের কবিদের লেখার মধ্য দিয়েই ঐতিহ্য প্রবাহিত হয়, তাঁদের লেখার গড় মানই আমাদের জানিয়ে দেয় একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ ভাষার সাহিত্যে উৎকর্ষের সীমা কতদূর বিস্তৃত। ঐতিহ্য-অনুসারী কবিরা শব্দের নবীকরণও করে থাকেন। কিন্তু এলিয়ট যখন তা করেন তখন যে আশ্চর্য প্রাপ্তি আমাদের ঘটে তা অতুলনীয় : তিনি অর্থ এবং ব্যুৎপত্তির দিকে নিবিড় নজর রেখেই demotic ("ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড"), dissembled ("অ্যাশ ওয়েনস্‌ডে") এবং significsnt soil ("দ্য ড্রাই স্যালভেজেস") এর মত শব্দ ও শব্দবন্ধ তৈরী করেন বা পুনর্বহাল করেন। যে প্রক্রিয়াতে এটা ঘটে তা অননুকরণীয়।

তাঁর বিখ্যাত "ইয়েটস মেমোরিয়াল লেকচার"-এ এলিয়ট বলেছিলেন : 'যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতাকে ক্রমাগত আত্মসাৎ করতে পারেন তিনি আপন জীবনের প্রত্যেক দশকে নিজেকে নতুন এক একটি জগতে পুনরাবিষ্কার করেন, কারণ প্রত্যেকটি দশককে তিনি দেখেন নতুন দৃষ্টিতে, তাঁর শিল্পের উপাদান নিরন্তর নবীকৃত হয়।' অবশ্যই কবির কবিসত্তা এবং ব্যক্তিগত সত্তার বিকাশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না—কোনও এক সময়ে এসে যদি তাঁর মনে হয় যে ইতিমধ্যে প্রযুক্ত প্রকরণে তাঁর কাব্যিক উদ্দেশ্য সাধন আর হবে না তাহলে তো কারণ হিসেবে এটাই বলতে হবে যে ঐ প্রকরণের প্রয়োগকর্তা হিসেবে তিনি নিজে যে দৃষ্টিভংগীর অধিকারী একসময়ে ছিলেন তার পরিবর্তন ঘটে গেছে। অর্থাৎ কলাকার হিসেবেই শুধু নয় মানুষ হিসেবেও তিনি খানিকটা বদলে

—৩

গেছেন। তবু পুনরাবৃত্তির প্রলোভন সম্বরণ করতে খুব কম শিল্পীই পারেন। এলিয়ট নিজে পেরেছিলেন। তাই তাঁর সৃষ্টিশীল বছরগুলিকে নির্দিষ্ট কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় যার প্রতিটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর কবিতাগুলি কারিগরী দক্ষতার অনন্ত নিদর্শন, কিন্তু সবচেয়ে বেশী আকর্ষক তাদের নিটোল সম্পূর্ণতা, তাদের সমাপ্তির সৌকর্য। তার অর্থ এই নয় যে পর্যায়ক্রমে তিনি বিভিন্ন ধরণের কবি, এক এলিয়ট অন্য পর্বে অন্য এলিয়ট। বরং দর্শনীয় ক্রম-পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত হিসেবে ইয়েটস অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য।

কারিগরী নৈপুণ্যের দিক থেকে চোখ সরিয়ে একটু অন্যভাবে দেখলে এটা স্পষ্ট হবে যে এলিয়টের কাব্যকীর্তির পরিসরে যে পরিবর্তন পরবর্তী পর্বে লক্ষ্যনীয় তা আদতে এক অবশ্যম্ভাবী বিবর্তন। তাঁর শেষের দিকে লেখা কবিতায় যে সব উপাদান আমরা পাচ্ছি সেগুলি তাঁর প্রথম জীবনের পরিপক্ক কবিতাগুলিতেও লভ্য। যে ক্ষমতা এবং সম্ভাবনা চিরদিনই তাঁর দখলে ছিল তারই বিকাশ ঘটেছে তাঁর উত্তরজীবনের সৃষ্টিকর্মে। দুটো বিপরীতধর্মী সাহিত্যশক্তি তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করেছে দীর্ঘদিন ধরে: এক, ফরাসী সিমবলিজম থেকে নেওয়া সেই প্রবণতা যা এমন সাহিত্য অভিমুখী যাতে না থাকবে বাইরে থেকে পাওয়া নজীর-নির্দেশ, না শোনা যাবে কবির নিজের কণ্ঠস্বর; অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংগীত ধর্মী সাহিত্য (কাব্য) সৃষ্টির প্রবণতা। দুই, ওয়ার্ডস্‌ওয়র্থ এর সময়ে প্রকট হয়ে ওঠা সেই মেজাজ যা কবির অন্তরতম সত্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকাশের প্রতি অনুগত। (এই দ্বিতীয় প্রবণতা আমাদের শতাব্দীতে অনেক অন্তর্গূঢ় আত্মকথনের জন্ম দিয়েছে।) এজরা পাউণ্ডের "ক্যান্টোজ", এলিয়টের "ওয়েস্টল্যাণ্ড", জেম্‌স্ জয়েস এর "ইউলিসিস" সবই এই দুই প্রবণতার টানাপোড়েনের ফসল। এলিয়টের সব লেখাতেই আধুনিকতার এই দুই ধারাস্রোত মিলেছে, পরস্পর ক্রিয়া করেছে। রোম্যান্টিক আকুতির শৈথিল্য বুদ্ধিবৃত্তির শৃংখলে বেঁধে নিয়মের অনুবর্তী করার কাজটি এলিয়ট বারেবারেই করেছেন। তাঁর নিজের শৈশবে মৃত ঠাকুর্দার তৈরী করা নিয়মের রাজত্ব তিনি দেখেছেন তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডলে। পরবর্তী-কালে তাঁর মনে হয়েছে জীবনের শুরুতে সমাজ ও পরিবারের আইনকানুন মেনে চলবার এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির বিষয়টিকে সাধারণ শুভচেতনায় বিলীন ক'রে দেওয়ার প্রশিক্ষণ তিনি এভাবেই পেয়েছেন। তাঁর পরবর্তী জীবন এবং রচনায় এই প্রশিক্ষণের শুভচিহ্নগুলির বাহক।

সচেতন, নিপুণ, পরিপূর্ণ এই শিল্পী, টি. এস. এলিয়ট তাঁর অনুগামীদের জন্যে অত্যন্ত দুরূহ এক আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু থেকেই পূর্ণতা ছিল, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা পরিপূর্ণ হয়েছে, এইমাত্র।

এলিয়টের কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে

সুজিত সরকার

কবিই কবিতার শ্রেষ্ঠ সমালোচক। অকবির কাব্যসমালোচনা কবির কাব্যসমালোচনার চেয়ে অনেক বেশি সুচিন্তিত, সুলিখিত, গুরুত্বপূর্ণ, নিরপেক্ষ হ'তে পারে, কিন্তু কবির কাব্যসমালোচনায় থাকে কাব্যভাবনা বিষয়ে মৌলিক উপলব্ধির প্রকাশ। তাই, কবির কাব্যসমালোচনা শিথিল, উচ্ছ্বসিত হ'লেও কবিদের কাছে তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয়। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও অশ্রুকুমার সিকদার আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় কাব্যসমালোচক, কিন্তু বুদ্ধদেব বসু ও শঙ্খ ঘোষ আমাদের প্রিয় কাব্যসমালোচক। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: 'কবিতা সম্বন্ধে বড়, সত্যার্থী আলোচনা কবিদেরই করা উচিত।....'শুধু জীবনানন্দ কেন, এলিয়ট-কেও কি আমরা এরকম কথাই বলতে শুনিনি? ফরাসী কবিতার বিষয়ে এজরা পাউণ্ড যে আলোচনা করেছেন, তা এলিয়ট মেনে নিতে পারেননি, যেহেতু সেখানে মালার্মের আলোচনা নেই, ভালেরির শ্রেষ্ঠ রচনাটিরও উল্লেখ নেই। তবু, এলিয়ট স্বীকার করেছেন যে, পাউণ্ডের কাব্যসমালোচনা তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, তাঁর যাবতীয় সমালোচনা আসলে একজন কবির কবিতা বিষয়ে নিজস্ব ভাবনাচিন্তার আলোচনা। এলিয়ট এই শতাব্দীর একজন প্রধান কবিই শুধু নন, একজন প্রধান কাব্যসমালোচকও। কবি ও কবিতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত পরবর্তী কালে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে —এমন অবশ্য মনে করার কোনো কারণ নেই। যে 'নৈর্ব্যক্তিকতা'কে এলিয়ট মহৎ কবিতার প্রধান লক্ষণ ব'লে স্বীকার ক'রেছেন, তাকে স্বীকার না ক'রেও পরবর্তীকালে অনেকেই ভালো কবিতা লিখেছেন। বোদলেয়ারের কবিতায়, এলিয়ট লক্ষ করেছেন, দুর্বলতা: 'নরক-পরিক্রমা থাকলেও স্বর্গ নেই'। 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'র 'সংশোধক' রূপে তিনি প্রস্তাব করেন দান্তের 'লা ভিতা নুওভা' ও 'লা দিভিনা কোমমেদিআ' কিন্তু এলিয়টের এই মত মেনে নিতে পারেননি বুদ্ধদেব বসু। তিনি মনে করেন 'নরক, শোধনাগার ও স্বর্গের বিভেদ দান্তের মনে যেমন গাণিতিক ভাবে সত্য ছিলো, আধুনিক মানুষ বোদলেয়ারের পক্ষে তেমনটি সম্ভব ছিলো না; বরং তাঁর বিশেষ গৌরব এখানেই যে, শেক্সপীয়র ও দস্টয়েভস্কির মতো, তিনি মানবাত্মাকে বহুস্তর ব'লে চিনেছিলেন: ব্যাধি ও স্বাস্থ্য, প্রেম ও ঘৃণা, আনন্দ ও আতঙ্ক, দ্রোহ আর আত্মসমর্পণ—এই বিরোধী ভাবগুলি, তাঁর ধারণায়, পরস্পর সংবদ্ধ শুধু নয়, পরস্পরের পরিপূরক।' কিন্তু, এসব সত্ত্বেও, এলিয়ট যে একজন প্রথম শ্রেণীর কাব্যসমালোচক, সেকথা সকলেই

স্বীকার করবেন।

'দান্তে' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে এলিয়টের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ রয়েছে। 'দ্য ডিভাইন কমেডি' সম্পর্কে এলিয়টের দুটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—(১) ঈজি টু রীড (২) ইউনিভার্সালিটি। 'দ্য ডিভাইন কমোডি' যে খুব সহজে পড়া যায়, তার কারণ অবশ্য এই নয় যে দান্তে খুব সহজ ইতালীয় ভাষায় এই মহাকাব্য রচনা করেছেন কিংবা এর বিষয়বস্তু খুব সাধারণ। এর কারণ, এলিয়টের মতে, এর ইউনিভার্সালিটি। এলিয়টের চোখে, দান্তে হ'লেন 'দ্য মোস্ট ইউনিভার্সাল অফ পোয়েট্স্ ইন দ্য মডার্ন ল্যাঙ্গোয়েজেস'। দান্তের 'দ্য ডিভাইন কমেডি' শুরু হয় এইভাবে: 'মধ্য জীবনে এসে এক অন্ধকার অরণ্যে পথ হারিয়ে আমি আসল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লাম।' বোঝা যায়, এই অভিজ্ঞতা যে কোনো কালের যে কোনো দেশের যে কোনো মানুষের হ'তে পারে। 'ডিভাইন কমেডি'র ইউনিভার্সালিটির অন্যতম কারণ এর রূপকধর্মিতা। দান্তে, ও শেক্‌স্‌পীয়রের একটি তুলনামূলক আলোচনাও এলিয়ট করেছেন তাঁর এই প্রবন্ধে। দান্তে ও শিক্‌স্‌পীয়রের মধ্যে কে মহত্তর—এই প্রশ্ন হাস্যকর। শেক্‌স্‌পীয়রের মধ্যে, এলিয়ট লক্ষ্য করেছেন, বিস্তৃতি; দান্তের মধ্যে, গভীরতা। দান্তে যখন ভার্জিলের সঙ্গে নরকের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যান, তখন দেখতে পান, নরকবাসীরা তাঁদের দিকে চেয়ে আছে। তাদের এই চেয়ে থাকাকে দান্তে, বর্ণনা করেন এইভাবে: 'তারা তাদের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ ক'রে আমাদের দিকে তাকালো যেমন ভাবে বুড়ো দরজী ছুঁচের গর্তের দিকে চেয়ে থাকে।' এই বর্ণনায় সমস্ত দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এলিয়ট বলেছেন, দান্তের কল্পনা 'ভিস্যুয়্যাল'। মানবজীবনের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে শেক্‌স্‌পীয়রের জ্ঞান অসামান্য, কিন্তু মানবজীবনের অবনতির গভীরতর ধাপগুলি ও উন্নতির উচ্চতর ধাপগুলি সম্বন্ধে দান্তের জ্ঞান নিঃসন্দেহে শেক্‌স্‌পীয়রের থেকে বেশি। শেক্‌স্‌পীয়রের বর্ণনা অনেক বেশি 'লোক্যাল', দান্তের বর্ণনা অনেক বেশি 'ইউনিভার্সাল'। দান্তের গীতিকবিতাগুচ্ছ 'লা ভিটা নুওভা' বা 'নতুন জীবন' আগেই রচিত। 'দ্য ডিভাইন কমেডি'র পাশে এই কবিতাগুলিকে যদিও খুবই সাধারণ মনে হয়, তবু এর গুরুত্ব কম নয়। কারণ, 'দ্য ডিভাইন কমেডি'কে ভালোভাবে বুঝতে গেলে এই কবিতাগুলি অবশ্যই পড়া উচিত। এলিয়ট ব'লেছেন, 'দ্য ডিভাইন কমেডি'র আগেই 'দ্য ভিটা নুওভা' প'ড়ে ফেললে, 'দ্য ভিটা নুওভা'কে সাধারণ কবিতা ছাড়া কিছুই মনে হবে না। কিন্তু 'দ্য ডিভাইন কমেডি'র পরে পড়লে বোঝা যাবে, কবি হিসেবে দান্তের সঠিক মূল্যায়নের জন্য কেন এই সাধারণ কবিতাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এলিয়ট তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' উৎসর্গ ক'রেছিলেন এজরা পাউণ্ডকে। উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় তিনি যে ইতালীয় কথাটি ব্যবহার ক'রেছিলেন,

সেটি দান্তের 'লা দিভিনা কোম্মেদিয়া'র 'পুরগাতোরিও' পর্যায় থেকে নেওয়া। কথাটির বাংলা অর্থ 'এক ওস্তাদ কারিগর'। একথা আজ অনেকেরই জানা যে, 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'কে এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতায় উন্নীত করার পেছনে পাউণ্ডের অবদান অনেকখানি। 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'-এর যে মূল পাণ্ডুলিপিটি এলিয়ট প্যারিসে পাউণ্ডের হাতে তুলে দেন, তা, এলিয়টের ভাষাতেই 'কেয়টিক'। পাউণ্ডের সংশোধন ও পরিমার্জনায় কবিতাটির আয়তন অর্ধেক হয়ে যায়। এলিয়ট ব'লেছেন, মূল পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব এই কারণে যে, তাঁর যে সমস্ত শব্দ, পংক্তি ও কাব্যাংশ পাউণ্ড কেটে বাদ দিয়েছিলেন, তা-ই পাউণ্ডের 'ক্রিটিক্যাল জিনিয়াস' বোঝাবার পক্ষে সর্বোত্তম উদাহরণ। এলিয়ট তাঁর পাউণ্ড বিষয়ে রচিত প্রবন্ধে পাউণ্ডের অফুরন্ত প্রাণশক্তি, নবীণ শক্তিশালী কবির অনুসন্ধানে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ও তাঁর সদাভ্রাম্যমান চরিত্রের উল্লেখ ক'রেছেন। এলিয়টের মতে, পাউণ্ড হয়তো নতুন কবির সৃষ্টি করতে পারেননি, কিন্তু তিনি সেই পরিবেশ গ'ড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলে ব্রিটিশ ও আমেরিকান কবিতায় আধুনিকতার আন্দোলন সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। পাউণ্ডের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'ক্যাণ্টোস' এর মধ্যে ইয়েট্স্ লক্ষ ক'রেছেন 'ল্যাক অফ ইউনিটি'; এলিয়টও লক্ষ ক'রেছেন 'অ্যান ইনক্রীসিং ডিফেক্ট্ অফ কমিউনিকেশন'। কিন্তু 'ক্যাণ্টোস' যে মহৎ কবিতা, সে বিষয়ে এলিয়টের কোনো সন্দেহই ছিলো না। তিনি ব'লেছেন : 'এমন কোনো জীবিত কবিকে আমি জানি না, যিনি এরকম লিখতে পারেন। এর অর্ধেক ভালোই বা ক'জন লিখতে পারেন?'

কবি ইয়েট্সের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন এলিয়ট। ইয়েট্স্কে তিনি ব'লেছেন 'প্রী-এমিনেন্টলি দ্য পোয়েট অফ মিডল্ এজ'। অবশ্য, এর মানে এই নয় যে, ইয়েট্স্ মধ্যবয়স্ক পাঠকদের কবি। এলিয়ট আসলে বলতে চেয়েছেন, ইয়েট্স্ই সম্ভবত এই পৃথিবীর একমাত্র কবি, যিনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, চারপাশের জগতের ব্যাপক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের কবিতাকেও পর্বে পর্বে পালটে নিয়েছেন। পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়াবার এই সাহস ও আশ্চর্য সততাকে প্রশংসা না ক'রে উপায় নেই। এলিয়ট আরো ব'লেছেন, ইয়েট্সের মধ্যজীবনে ও শেষজীবনে রচিত কবিতাবলী তরুণ কবিদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়া উচিত এই কারণেই যে, একজন শিল্পীর প্রকৃত চরিত্র কীরকম হওয়া উচিত—এই কবিতাবলী তার সার্থক দৃষ্টান্ত। 'শিল্পের জন্য শিল্প'—এই মতবাদের যুগে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং 'কবিতাকে হয়ে উঠতে হবে সমাজগঠনের হাতিয়ার'—এই মতবাদের যুগে বেঁচে থেকে ইয়েট্স্ সেই পথেই হেঁটে গেছেন, যা, এলিয়টের মতে, একজন প্রকৃত শিল্পীর পথ, অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুই মতবাদের মধ্যবর্তী এক পথ। ইয়েট্স্ দেখিয়ে গেছেন, একজন শিল্পী যদি সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে সারাজীবন তাঁর শিল্পের কাজ ক'রে যেতে পারেন,

তাহ'লেই নিজের দেশ ও সারা পৃথিবীর প্রতি তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্তব্য পালন করবেন। এলিয়ট আরো ব'লেছেন, বিশ্ববন্দিত বৃদ্ধকবি ইয়েট্‌স্ নিজের খ্যাতির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তরুণ কবিদের সঙ্গে কবিতার আলোচনায় মেতে থাকতেন, তার থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, শিল্পীর চেয়েও শিল্প বড়ো।

কবিতার সামাজিক কাজ কী—এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এলিয়ট ব'লেছেন, একজন কবি পরোক্ষ ভাবে সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ক'রে যান। কবির প্রত্যক্ষ কর্তব্য তাঁর মাতৃভাষার প্রতি – ভাষাকে রক্ষা করা, বিস্তৃত করা ও উন্নত করা। স্বকীয়তা অর্জনের তাগিদে কবিরা যে নিরন্তর শব্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যান, তা একটি জাতির ভাষাকেই ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত ও সুন্দর ক'রে যায়। সাধারণ মানুষ না জেনেই এই পরিবর্তিত ভাষাকে ব্যবহার করতে থাকেন এবং তারপর, কখন যেন, এই পরিবর্তিত ভাষাই প্রচলিত ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে কবি পরোক্ষভাবে সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন ক'রে যান।

কাকে আমরা 'মেজর' কবি বলতে পারি? কাকেই বা 'মাইনর'? এলিয়ট বলেছেন, বড়ো কবি তিনিই, যাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি ভালোভাবে বোঝার জন্য সব কবিতাই, এমনকি অত্যন্ত সাধারণ মানের কবিতাগুলিও, পড়া দরকার। শেক্‌স্‌পীয়রের সব নাটকই পড়া দরকার তাঁর যে কোনো একটি নাটককে ভালোভাবে বোঝার জন্য। দান্তে সম্বন্ধেও যে এলিয়ট প্রায় এই ধরণের কথাই বলেন, তা আগেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ 'মেজর' কবি তিনিই, যাঁর সারা জীবনের বিভিন্ন রচনার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে এক 'ইউনিটি' রয়ে গেছে। আর, 'মাইনর' কবি তিনিই, যাঁর কবিতাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে ভালো, যাঁর বিশেষ একটি ভালো কবিতা বোঝার জন্য অন্যান্য কবিতা পড়ার দরকার হয় না অর্থাৎ যাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে কোনো 'ইউনিটি' নেই।

একজন কবি কেন কবিতাবিষয়ক গদ্য লেখেন? এর একমাত্র কারণ এই যে, তিনি তাঁর নিজের কবিতাকেই আসলে পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চান। বোদলেয়ার পো-কে সমর্থন ক'রে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। পো নিশ্চয়ই বোদলেয়ারের মতো শক্তিশালী কবি ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথও বিহারীলালের কবিতার প্রশংসা করেন, যদিও একথা সকলেই স্বীকার করবেন, রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের তুলনায় অনেক অনেক বড়ো কবি। তবু যে তাঁরা এরকম করেন, তার কারণ, পো-কে সমর্থনের মধ্যে দিয়ে বোদলেয়ার আসলে নিজের কাব্যভাবনাকেই পরোক্ষে সমর্থন করেন, কারণ তাঁরা একই পথের পথিক। আর, অনুরূপ কারণেই, রবীন্দ্রনাথও বিহারীলালের কাব্যের প্রশংসা করেন। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্যের অলোচনায় সমালোচকগণ সবচেয়ে বেশি নির্ভর ক'রেছেন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থদের আত্মপক্ষসমর্থনে রচিত গদ্য 'প্রীফেস'

টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস্'—এর ওপর। এলিয়ট দান্তের প্রসঙ্গে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন এই কারণেই যে তাঁর নিজের সমগ্র কবিতা হয়ে উঠতে চেয়েছে আধুনিক যুগের 'দ্য ডিভাইন কমেডি'—নরক পেরিয়ে স্বর্গের দিকে যাত্রা। বিস্মৃতপ্রায় মেটাফিজিক্যাল কবি ডানকে এই শতাব্দীতে এলিয়ট যে আবার আমাদের নতুন ভাবে চিনিয়ে দেন, তার কারণ এই যে, ডানের কবিতায় যেমন উপমার চমৎকারিত্ব লক্ষ করা যায়, এলিয়টের কবিতার মধ্যেও তেমনই আমরা লক্ষ ক'রে থাকি। প্রেমিক-প্রেমিকার সাময়িক বিচ্ছেদকে ডান তুলনা করেন কম্পাসের সঙ্গে, আর, এলিয়টও সন্ধ্যার আকাশকে তুলনা করেন হাসপাতালের টেবিলে অজ্ঞান ক'রে শুইয়ে রাখা রোগীর সঙ্গে। ফরাসী প্রতীকী কবিদের মধ্যে এলিয়ট ভালেরি, লাফর্গ ও করবিয়েরকে নির্বাচন ক'রে নেন ; লাফর্গের কবিতায় যে অনিশ্চয়তা, অবসাদ ও একঘেয়েমির ছবি ফুটে ওঠে, সেই একই ছবি ফুটে ওঠে এলিয়টের কবিতার মধ্যেও। এলিয়টের কবিতা যেমন আমাদের নতুনভাবে, সম্পূর্ণ নতুন চোখ নিয়ে কবিতাকে দেখতে শেখায়, তেমনই তাঁর কাব্যসমালোচনাও আমাদের নতুনভাবে কবিতাকে বুঝে নিতে শেখায়। এ কারণেই সমালোচক হিসেবে তাঁর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

তীর্থযাত্রী এলিয়ট

বীতশোক ভট্টাচার্য

টি. এস. এলিয়টের ইংরেজি কবিতা জর্নি অব দ্য মেজাই-এর নির্ভরে এ আলোচনা। কবিতাটি ১৯২৭ কৃশ্চান অব্দে রচিত। আলোচনার সুবিধার জন্য এর পর থেকে কবিতাটিকে মেজাই বলা হবে।

টি. এস. এলিয়ট জন্মসূত্রে মার্কিন, পরে বৃটিশ নাগরিক ও অ্যাংলো-ক্যাথলিক হন। সাহিত্য ও সমাজ-সমালোচক এবং নাট্যকাররূপে বিখ্যাত হলেও এলিয়ট প্রথমত ও প্রধানত ইংরেজি ভাষার এক প্রধান কবি। যদিও এলিয়টের কবিতার জীবন ১৯০৯ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, তিনি ১৯২৫-এর পর থেকে ইংরেজি কবিতায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন এবং ১৯৪৮-এ নোবেল পুরস্কার পান। মেজাই এই অভিঘাত-প্রবণ সময়ের রচনা।

এলিয়টের কবিতাকে চারটি প্রধান পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বের কবিতার মধ্যে প্রেল্যুডস ও দ্য লভ সং অব জে আলফ্রেড প্রুফ্রক উল্লেখের যোগ্য। দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড কাব্যের কথা বিশেষ ভাবে বলতে হয়। তৃতীয় পর্বে আছে তাঁর কৃশ্চান কবিতাগুচ্ছ। চতুর্থ পর্বে আছে ফোর কোয়ার্টেটস। মেজাই এই তৃতীয় পর্বের রচনা। এই পর্বের রচনাকাল ১৯২৭ থেকে ১৯৩০। স্পেণ্ডরের মতে তা ১৯৩১ পর্যন্ত বিস্তৃত।

এলিয়ট ১৯২৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার প্রতিষ্ঠানটির কর্মী এবং পরে একজন কর্তা হিশেবে বড়োদিন উপলক্ষে ক্রসমাস কার্ডের জন্য কিছু কবিতা লিখে গিয়েছেন। তাঁর কাব্যসংকলনে এই সব কবিতা এরিয়েল পোয়েমস নামে স্থান পায়। মেজাই এই কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিতা। এটি এলিয়টের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সব থেকে জনপ্রিয় কবিতার একটি।

এলিয়ট ১৯২৭-এ চর্চ অব ইংলণ্ডের স্বীকৃতি পান। এই বছরই জর্নি অব দ্য মেজাই প্রকাশিত হয়। ১৯২৯-এ অ্যানিমুলা প্রকাশিত হয়। এই বছর এলিয়ট তাঁর দান্তে বিষয়ে রচনাটি প্রকাশ করেন। ১৯৩০-এ তাঁর বোদলেয়র বিষয়ে গদ্য এবং মেরিনা কবিতাটি প্রকাশ পায়। এই বছরগুলি ধরে তাঁর অ্যাশ ওয়েনেসডে কাব্যটিও প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুচ্ছ স্বভাবে ধর্মীয়। দান্তে ও বোদলেয়র বিষয়ে লেখা গদ্য তাঁর এই সময়ের কবিতার সূত্র ধরিয়ে দেয়। এই সময় এলিয়টের সঙ্গে তাঁর প্রথম স্ত্রী ভিভিয়েনের সম্পর্ক ভালো ছিল না। এই তিক্ত অসুখী সম্পর্কের জন্য এলিয়ট নিজেকে দায়ী করেছেন। এই কবিতাগুচ্ছেও তাঁর ব্যক্তিগত পাপ ও অপরাধবোধের ছায়া পড়েছে। মেরিনা এই অন্ধকার পর্যায় পার হওয়ার কবিতা। মেজাই কবিতায় এ

অন্ধকার বদ্ধমূল, যেন এখনই কোনো আলোর উত্তরণ নেই।

বাইবেলের একটি সরল গভীর ও পরিচিত গল্প এই কবিতার পট রচনা করেছে। সন্ত ম্যাথ্যুর সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাহিনীটি আছে। মেজাই অর্থাৎ তিনজন জ্ঞানী মানুষ বা তিনজন রাজা। মেজাই প্রাচ্য থেকে একটি তারা দেখে দেখে নবজাত জেজস ক্রাইস্টের কাছে উপনীত হন, তাঁকে প্রথম কৃসমাসের উপহার রূপে সোনা, ধুনো এবং গুগ্‌গুল দেন। মেজাই-এর তাৎপর্য নিয়ে তর্ক আছে। সে তর্ক এ আলোচনায় এড়ানো যাবে না।

এলিয়টের কবিতাটিতে মেজাই-এর গল্পের আভাষ আছে, তাঁদের পথ-দেখানো তারার প্রসঙ্গটি তিনি বাদ দিয়েছেন। ধর্মপ্রাণ সাধারণ কৃশ্চানরা এখনো তারাটিকে মর্যাদা দেন। মধ্যযুগের ইয়োরোপে কৃশ্চান যাজকরা যে ধর্মীয় যাত্রা অনুষ্ঠান করতেন তাতেও তারাটি সম্মান পেয়ে এসেছে। লাতিন ভাষায় এই কৃশ্চান যাত্রানাটককে ও ফিকিউম স্তেল্লা বলা হতো। এর অর্থ অফিস অব দ্য স্টার। মেজাইকে যাত্রার পথে তারাটি নিশানা দেখিয়েছিল তাই এরকম বলা হতো। ১৯২৫-এ রচিত কবিতা দ্য হলো মেন কবিতায় এলিয়ট নিজেই বারবার তারার চিত্রকল্প ব্যবহার করে এসেছেন। ১৯২৭-এ মেজাইতে তিনি তা বাদ দিলেন, প্রয়োজনীয় মনে হলেও বাদ দিলেন। না ইতিহাস, না পুরাণ, এলিয়ট কোনো কিছুকে এখানে গুরুত্ব দেন নি। মেজাইতে তিনি নিজস্ব মিথ নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তিন স্তবকে একটি নাটকীয় কথনের মধ্যে এই মিথ রূপ পেয়েছে। তিনজন বিমূঢ় তাড়িত বৃদ্ধ মানুষের তিক্ত ক্রান্তদর্শী স্মৃতির কথা একযোগে একটিই অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে।

প্রথম স্তবকে অসময়ে তীব্রতম শীতে দুর্গম পথে মেজাইয়ের দীর্ঘ যাত্রার কথা বলা হয়েছে। মেজাই একদিকে বাসন্তী বিলাসের স্মৃতিতে উন্মন অন্যদিকে মদ্যপ লম্পট উট-চালকদের নিয়ে বিপর্যস্ত। রাত্রে তাঁদের পথ চলার শেষ নেই, তাঁরা প্রতিকূল পরিবেশ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ক্রমশ এগিয়ে চলেছেন।

দ্বিতীয় স্তবকে উষা ও শ্যামলিমা দেখা দিয়েছে। তুষারসীমার নিচে দিগন্তলীন তিনটি গাছ এবং প্রান্তরে এইমাত্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়া একটি শাদা ঘোড়ার দৃশ্য। শরাইখানার লিনটেলে আঙুরলতা তোলা, খোলা দরজায় ছয় জুয়াড়ি খেলছে। সব মিলিয়ে এ অভিজ্ঞতা খুব তৃপ্তিজনক নয়।

তৃতীয় স্তবকে মেজাই-এর বিচলিত অথচ অনুসন্ধিৎসু ভাবনার কথা আছে। একটিমাত্র জন্ম, মাত্র একটি মৃত্যুর জন্য এতদূর এসে তাঁরা আশ্চর্য। তাঁদের কাছে যিশুর জন্ম এক যন্ত্রণামথিত অভিজ্ঞতা। তাঁদের কাছে অনাত্মীয় অথচ নিজ বাসভূমে ফেরাও মৃত্যুর সমতুল এক অভিজ্ঞতা। তাই শেষ পর্যন্ত আরেক মৃত্যুর জন্য উন্মুখতা থেকে যায়।

এ কবিতায় যে অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে তার অনেকখানি এলিয়টের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা। এলিয়ট এখানে মধ্যপ্রাচ্যের মরুপথে উট আরোহণে দুরূহ যাত্রার যে কথা বলেছেন তা অনুমান করা হয় ফরাসি আধুনিক কবি সাঁ জঁ পার্সের আনাবাস বই থেকে নেওয়া। এলিয়ট তখন বইখানি পড়ছিলেন এবং অনুবাদ করছিলেন। পথচলতি মনে ছাপ রেখে চলে যাওয়া তুচ্ছ অভিজ্ঞতা আবেগের সূত্রে চিত্রকল্পে কখন কিভাবে দানা বাঁধে তা বোঝা মুশকিল। জলযন্ত্র আছে এমন এক ছোটো ফরাসি রেলপথ জংসনে রাতের খোলা জানালা দিয়ে দেখা ছজন তাশ খেলুড়ের ছবি যে মেজাই-এর দ্বিতীয় স্তবকে মূর্ত হয়ে উঠেছে তা এলিয়ট নিজে ব'লে না দিলে পাঠক জানতে পারতেন না।

এলিয়ট নিরাসক্ত ভঙ্গিমা বজায় রেখে এ কবিতা লেখা শেষ করে উঠতে পেরেছেন। তবু নৈর্ব্যক্তিকতার মলাট ছাপিয়ে ব্যক্তিগত মুখের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠতে চেয়েছে। মেজাই-এর অনুতাপ ও শোচনার যে রূপ এখানে প্রকাশ পেয়েছে তা কী এলিয়ট দম্পতির অসুখী অসুস্থ সম্পর্কের অন্য এক ফলিত মূর্তি? বসন্ত মঞ্জিলের চাতালে শরবতের পেয়ালা হাতে দাঁড়ানো রেশমি যুবতীর স্মৃতি তিক্ত বিরক্ত বুড়ো মেজাইকে টানে। কিন্তু অন্যদিকে মদখোর মেয়েখোর পিছু-হাঁটা উটওয়ালাদের রকমশকম মেজাই-এর ভালো লাগে না। এলিয়টের পিউরিটান হাবভাবের মধ্যে এই উভযোজ্যতার শিকড় আছে। পাঠকের মনে পড়ে এলিয়টের আফটর স্ট্রেঞ্জ গডস বইটির প্রকাশ ও প্রত্যাহারের ঘটনা, ডি. এচ. লরেন্সের সংরক্ত রচনায় তাঁর আপত্তি ও সমর্থন। ইন্দ্রিয় থেকে মানুষ যে বেদনা ও আনন্দ পায় এলিয়ট তাকে বলেন মৃত্যুর প্রাপ্তি, একই নিশ্বাসে তাকে বলেন জীবনের অর্জন। ফিটজেরাল্ডের ওমর খৈয়াম থেকে যেন সরাসরি উঠে আসা শরতের পেয়ালা হাতে চাতালের ওই রেশমি যুবতীরা আর এলিয়টের মেজাইয়ের মধ্যে ভিকটোরিয়ান শুচিবায়ু।

মেজাই-এর বিষয়টি প্রসঙ্গের দিক থেকে ধর্মের, পদ্ধতির দিক থেকে নাটকের। সংলাপে ধরা এ কবিতার উক্তি ধর্মকে কিছুটা গড়েছে, ধর্ম ও কবিতায় কিছুটা নাটকের গঠন এনে দিয়েছে। ধর্ম এবং কবিতাকে যাঁরা অধুনা মঞ্চে ফিরিয়ে এনেছেন এলিয়ট তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে আছেন। ধর্মের একটি আদিম আনুষ্ঠানিক দিক আছে। মেজাই-এর অব্যবহিত আগেকার লেখা ফু হলো যেন কবিতায় নাটকীয় ধর্ম অনুষ্ঠান সম্পর্কে এলিয়ট কোনো সুস্থিত দৃষ্টিকোণ তৈরি করে দিতে পারেন নি ; এক্ষেত্রেও উভযোজ্য-তায় তাঁর মূল্যবোধ দোল খেয়েছে। ফলে কখনো যা লোকায়ত বসন্ত উৎসবের উৎফুল্ল মে-পোল, তা পরক্ষণে যিশুকে আর্ত অর্পণের আধার গম্ভীর ক্রসকাঠ, আর তার পরেই দুহাত ছড়ানো ব্যঙ্গবিদ্ধ কাকতাড়ুয়া। ভরা ফসলের খেতে উড্ডীন ধ্বজা আর কাকতাড়ুয়া অবশ্যই এক সূত্রে মেলে, ক্রসের অনুভূমিক ও

উলম্ব রেখায় জীবন আর মৃত্যুও আড়াআড়ি মিলে যায়। সমালোচনার পরিভাষায় এলিয়ট যাকে বলতেন অবজেকটিভ কোরিলেটিভ সেই পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়ের আশ্রয় এই মেজাই-এর প্রসঙ্গ। তার তন্নিষ্ঠ সংশ্লেষে কৃশ্চান ধর্ম ও নাটকীয় কবিতা মিলে যায়, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা একাকার হয়।

এলিয়টের কবিতায় আমি এবং আমরা প্রায় স্থান বিনিময় করে। মেজাইতেও তাই ঘটেছে। মেজাই তিনজন। তাঁরা যখন তিনজনে মিলে আমরা বলছেন তখন এ কবিতায় সমবেত কথন পাওয়া যাচ্ছে। আর যখন তা একজন মেজাই-এর উচ্চারণ. ট্রাজিডি নাটকের কোরাসপ্রতিম এক চরিত্রের সংলাপ বা একোক্তি। এ মনোকথন মেজাই-এর একজনের, এ মনোকথন এলিয়টের। আমি ও আমরার এ দুটি স্তর ভেঙে কথন এসেছে দুটি ধারায়: দৈনন্দিন সংলাপের মৌখিক বাক্‌রীতিতে, ট্রাইবের সে ভাষাকে এলিয়ট বাইবেলের ভাষা দিয়ে পরিস্রুত করে নিয়েছেন। আর এসেছে অভাষিক বোধ, এক অনিশ্চিত সন্ধানের ধারণা, এবং এলিয়ট তাকেও কৃশ্চান অস্তিবাদী অ্যাংগষ্ট দিয়ে পরিস্রুত করে নিয়েছেন। যে শুদ্ধতার অন্বেষণে ইয়েটস জাপানি নো নাটকের কাছে গিয়েছিলেন সে অন্বেষণে এলিয়ট গ্রীক নাটকের দ্বারস্থ। মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল এ তার পূর্ণ পরিচয় আছে। মেজাই ধর্ম-নির্ভর কাব্যনাটক নয়, কৃশ্চান বিশ্বাসীর উক্তি ও উপলব্ধির কবিতা, মেজাই-এর অকৃশ্চান প্রত্যয় এর মধ্যে বাদ সেধেছে।

মেজাইতে নাটকের উক্তির আধারে চরিত্রটির এবং অথবা চরিত্র তিনটির স্বভাবের উপরিতল উলটেপালটে গেছে, তাঁদের বিপন্ন বিস্মিত বাস্তব প্রকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। শূন্য থেকে মাতা মেরির কোলে সন্তান আসার পৌরাণিক পটভূমি থাকায়, পরিত্রাতা যিশু এবং রোমান হেরড রাজার ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকায় মেজাই-এর ঘটনাটি এমনিতে যথেষ্ট দূরে চলে গিয়েছিল, কথকের কবিতায় উচ্চারণ মানানসই হয়েছে অন্য কারণে। তিনটি স্তবকে যাত্রা, উপনয়ন ও সংশয়ের তিনটি মাত্রায় অভিঘাতের তীব্রতার তরতম ঘটিয়ে আরো নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন। ইয়েটস তাঁর দ্য মেজাই কবিতায় প্রচলিত বর্ণাঢ্য পোশাকে মেজাইকে দেখিয়েছেন। বর্ণাঢ্য পোশাকের ব্যবহারে কবিতাটি আরো চিত্রল এবং আরো নাটকীয় হয়ে উঠতে পারতো এ কথা কারো মনে হতে পারে। এলিয়ট সে সুযোগ নেন নি। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিমার পার্থক্যের জন্য দুজনের মেজাই বিষয়ক কবিতা দুরকম হয়েছে। ইয়েটস চেয়েছেন সেই দূরত্ব যা দৃষ্টিতে মায়া অঞ্জন বুলিয়ে দেয়। আর এলিয়ট চেয়েছেন আমি এবং আমরার ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে, দীক্ষাপেক্ষ পাঠকের পৃথিবীতে মেজাইকে নিয়ে আসতে তিনি সক্ষমও হয়েছেন। দুজনের উপস্থাপনও পৃথক: ইয়েটসের ছন্দের বন্ধন মেজাইকে অন্যদেশ কালে নিয়ে গিয়েছে। এলিয়টের বাক্‌রীতির অনুযায়ী গদ্য-কবিতা মেজাইকে এই সময়ে

এই সমাজে নিয়ে এসেছে। একটি ঐতিহাসিক এবং তাই নাটকীয় মুহূর্তের কিনারায় এলিয়ট মেজাইকে দাঁড় করিয়েছেন, এ ঝুঁকি আধুনিক নাটক অনেক সময়ই নেয় না। এলিজাবেথান নাট্যকার গদ্য আর কবিতার সংঘর্ষে যে ফল পেতেন এলিয়ট গদ্যকবিতার ব্যবহারে সেই সিদ্ধি পেয়েছেন।

এলিয়ট এসময় দান্তে বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, দেখেছেন মহৎ কবিতার আত্মার মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় দর্শন কথা বলে ওটে। বাইবেল ও কৃশ্চান প্রার্থনা পুস্তক এলিয়টের এ পর্যায়ের কবিতার উৎস। জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে এলিয়ট তখন কৃশ্চান ধর্মের দ্বারে হাত পেতে আছেন। ১৯২৭-এ এলিয়ট চর্চ অব ইংলণ্ডের স্বীকৃতি পেলেন, এটি এলিয়টের জীবনের একটি বিশুষ্ক তথ্য। তথ্যটি এলিয়টের চেতনায় অচেতন মনে ধর্মীয় ব্যঞ্জনা পেয়ে চলেছিল, দার্শনিক দ্যোতনা পেয়ে চলেছিল, একটি রহস্যে পরিণত হতে চলেছিল—আর ঠিক তখনই এলিয়টের আবেগ ও কল্পনা, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা খৃষ্টের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত ঘটনাকে মেজাইয়ের একটিমাত্র আর্কিটাইপে সংহত করে আনলো, প্রাপ্তি ও যন্ত্রণা একটি আনুষ্ঠানিক মর্যাদা পেল। এলিয়টের কাছে খৃষ্ট কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র যদি নাও হয়, খৃষ্টের জন্ম ও মৃত্যু কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা যদি নাও হয়, তবু খৃষ্ট তাঁর কাছে এক কবিতার কল্পতরু। শুধু মেজাইতে নয়, ফোর কোয়ার্টেটস পর্যন্ত, তার পরেকার কাব্যনাটকেও, এলিয়ট যেন ফিরে ফিরে একটি কথাই বলছেন: যা কিছু ধর্মীয় বাকে রূপান্তরের যোগ্য নয় তা কবিতা নয়। বাট সেট ডাউন/দিস সেট ডাউন/ দিস:। পুঁথি ও পুঁথি লেখার চিত্রকল্প দিয়ে দান্তে তাঁর মহাকাব্যে বিশ্বের রহস্য ধরতে চেয়েছেন। এলিয়টের কাছেও রহস্য শব্দে সংহত।

কৃশ্চানধর্ম যিশুখৃষ্টের কাব্যময় জীবন ও বাণীর ম্যাজিকে টিকে আছে। এই ম্যাজিক শব্দটি এসেছে মেজাই-এর সূত্রে। মূল গ্রীক শব্দটি ছিল মেগাস। লাতিনে একবচনে মেজুস এবং বহুবচনে মেজাই হয়। পণ্ডিতেরা প্রাচীন পারসিক পুরোহিত শ্রেণীর সদস্যদের মেজাই বলেছেন। অনেকে এদের ম্যাগি বলেন। প্রাচীন রোমান সমাজে অভিচার বা ম্যাজিক ছিল না এমন নয়, তবে তাঁরা মেজাই বলতে প্রাচ্যের যাদু ও জ্যোতিষে পারদর্শী মানুষদেরই বোঝাতেন। বাইবেলে তিনজন জ্ঞানী জ্যোতির্বিদ মতান্তরে তিনজন রাজাকে মেজাই বলা হয়েছে। তাঁরা প্রাচ্য থেকে একটি তারার পথ ধরে এসে নবজাত শিশু জেজাসকে বন্দনা করে গিয়েছিলেন। এলিয়ট মেজাই বলতে বোধহয় ঐ তিন পারসিককে বুঝিয়েছেন। দান্তের পারাদিজো একটি পারসিক শব্দ। গ্রীকরাও পরে পারসিকদের কাছ থেকেই যাদুবিদ্যা নিয়েছিল। জরথুশত্র মেজাই পুরোহিতের ধর্মগুরু। জরদারঙের উট বা জরৎ উষ্ট্র থেকে নাকি জরথুশত্র ধর্মগুরুর এই নাম এসেছে। এলিয়টের কবিতাটির

প্রথম স্তবকে মেজাই-এর সঙ্গে এইসব উট এবং তাঁদের সামনে পারসিক আবহের উল্লেখ আছে। জরথুশত্রপন্থীরা দ্বৈতবাদী, তাঁদের ধারণা আলো ও অন্ধকার এই দুটি সৌর শক্তির ধারাবাহী সংগ্রাম চলেছে। এলিয়টের কবিতায় প্রথম স্তবকের অন্ধকার কেটে গিয়ে দ্বিতীয় স্তবকের শুরুতেই আলো ফুটেছে।

পণ্ডিতদের কেউ কেউ মেজাই বলতে তিনটি দেশের রাজা বুঝেছেন। তাঁদের কাছে এই তিনটি দেশ হলো হলুদ মানুষ মোঙ্গলদের দেশ, শাদা মানুষ আর্যদের দেশ এবং কালো মানুষ নিগ্রোদের দেশ। লক্ষ করা দরকার মেজাই অর্থে তাঁরা তিনজন নন-সেমেটিক দেশের রাজা বুঝেছেন। এলিয়ট কী এই অর্থে মেজাই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন? কবিতাটির মধ্যেই একথা ভাবার কারণ আছে। মেজাই তৃতীয় স্তবকের শেষের দিকে বলছেন তাঁদের রাজ্যগুলির কথা, দেবদেবীর আঁকড়ে ধরা সেইসব রাজ্যের অধিবাসীদের কথা। কৃশ্চানদের কাছে কিংডম কথাটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে, এর আগে দ্য হলো মেন কবিতায় স্পষ্টই এ অর্থে এলিয়ট কিংডম শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তবু তিনটি রাজ্যের অধিকারী তিন রাজাকে মেজাই ভাবা চলে। তাঁরা খৃষ্টকে অনুলিপ্ত করার জন্য মির নিয়ে গিয়েছিলেন, এ উল্লেখ বাইবেলে আছে। মির শব্দের উৎস সেমেটিক। তাছাড়া কৃশ্চানরা সেণ্ট প্যাটরিকের বিরোধিতাকারী অকৃশ্চান যাদুকরকেও মেজাই বলতেন। কবিতাটি এলিয়টের এবং এলিয়ট অ্যানটি সেমেটিক কবি ব'লেই এটি আরো ভাববার কথা।

কৃশ্চান ধর্মতাত্ত্বিক তিনজন মেজাইকে ক্রমশ প্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্য থেকে আসা তিনটি সেমেটিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ভাবতে শুরু করেন। সেমাইট ও সেমেটিক দুটি শব্দ অনেকটা এক অর্থেই প্রযুক্ত হয়। বাইবেলের জেনেসিসে আছে যে, নোয়ার ছেলে শেম, আর তার ছেলেরা সেমাইট। হিব্রু, আরব, আসিরিয় ও আরামায়িক ভাষাভাষী লোকজনেরা সেমাইট। সেমেটিক বলতে এর সঙ্গে ইথিয়োপিয়ার ভাষা ব্যবহারকারী লোকজনদেরও বোঝায়। তবে সাম্প্রতিক কালে ইহুদিদেরই বিশেষ ভাবে সেমেটিক বলা হয়। অথচ বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট প্রথমে আরামায়িক এবং পরে হিব্রুতে লেখা হয়। হিব্রুভাষী ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে ওল্ড টেস্টামেন্টও পড়ে। আইজায়ার মতো হিব্রু ভবিষ্যৎবক্তারা ঘোষণা করেছিলেন যে একজন তথাগত বা মেসায়া আসবেন। নিউ টেস্টামেন্টের ম্যাথ্যু লুক ও জনের সুসমাচারে বিধৃত ভবিষ্যৎ-বাণীর সঙ্গে একথা মিলে যায়। মেজাই কবিতায় যাত্রীরা ভোরের দিকে যে দেশে এসেছে তা ইসরায়েল। বাইবেলে আছে যিশুর কাছে ইসরায়েলের এক রাজর্ষি নিকোদেমুস যিশুর কাছে জানতে এসেছিলেন আর যিশু তাকে বলেছিলেন: ইউমাস্ট বি বর্ন এগেন। মেজাইতে এর প্রতিধ্বনি আছে।

নিউ টেস্টামেণ্টে আছে মেজাই বলছেন: ইহুদিদের রাজা হয়ে যিনি জন্মেছেন তিনি কোথায়? কারণ আমরা পূর্বদেশে তাঁর তারা দেখেছি, তাঁকে বন্দনা করতে এসেছি। যিশু যে বেথলেহেমে জন্মেছিলেন তা ইহুদিদের দেশ ছিল। যিশুকে অঙ্গদীক্ষিত করা হয়েছিল, তাও একটি ইহুদি প্রথা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইয়োরোপিয় কৃশ্চানরা হিব্রুভাষীদের অথবা ইহুদিদের অস্বীকার করলে আশ্চর্য হতে হয়।

নবজাগরণের যুগের ইংলণ্ডে কৃশ্চানদের ইহুদি বিরোধিতার একটি হাওয়া উঠেছিল। মার্লোর দ্য জু অব মালটা এবং শেকস্পিয়ারের দ্য মার্চেণ্ট অব ভেনিস এইসময়কার লেখা। ইংরেজ কৃশ্চানদের ইহুদি বিরোধিতা কাজে লাগিয়ে তাঁরা বারাবাস ও শাইলকের মতো খল চরিত্র সৃষ্টি করে সফল হয়েছিলেন। সুদখোর বুড়ো ইহুদি শাইলক যে শেষ পর্যন্ত মানবিক এবং ট্রাজিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন তার জন্য শেকস্পিয়ারের প্রতিভার প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু ওথেলো ও শাইলক চরিত্রের স্রষ্টা শেকস্পিয়ারকে অ্যানটি সেমেটিক হওয়ার জন্য অপবাদ শুনতে হয়। ওথেলো এবং মার্চেণ্ট অব ভেনিসের অভিনয় বাতিল করারও দাবি তোলা হয়েছে। ইংলণ্ডের অ্যাংলো ক্যাথলিক নাগরিক টি. এস. এলিয়টও ঘোষিত ভাবে অ্যানটি সেমেটিক। এলিয়ট বিশেষত ইহুদিদের তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার জন্য চিহ্নিত। তাঁর কবিতা ও পত্রাবলিতে ইহুদিদের প্রতি নিন্দাসূচক অবিরল উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। মেজাই লেখার আগেও তাঁর এই স্বভাব ছিল, মেজাই লেখার পরেও তাঁর এই অভ্যাস যায় নি। উত্তরকালে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনে এলিয়ট অসংকোচে ঐসব নিন্দাসূচক প্রসঙ্গ পরিকীর্ণ কবিতার স্থান করে দিয়েছেন। অসভিটজের ইহুদিনিধন পর্বের পরেও তাঁর দৃষ্টির প্রসার ঘটে নি। মানুষ হিশেবে এলিয়ট কত খানি অসাড়, ধর্মধ্বজী এবং প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন এ তার এক ভালো নমুনা। ইংলণ্ডের প্রভাবশালী ইহুদিরা বিশ শতকের প্রধান আধুনিক কবিরূপে এলিয়টের গৌরব স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু এলিয়টের শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁরা মুক্তমনে যোগ দিতে যেতে পারছেন না। এরকম মুহূর্তে মনে হতে পারে যে, এজরা পাউণ্ডকে ফাসিবাদ যে অমানবিক টানে টেনেছিল, অ্যাংলো ক্যাথলিকবাদের প্রতি টি. এস. এলিয়টের অতিভক্তিও সেইজাতীয় আকর্ষণ। ইয়েটসের মিশ্র মরমিয়াবাদ যত হাস্যকর ও অসম্ভব শোনাক তাঁর চেতনায় এই সংকীর্ণতা ছিল না। এলিয়টের অ্যানটি সেমেটিক দৃষ্টির আলোয় তাঁর মেজাই-এর উচ্চারণ আরো অনিশ্চিত বোধ হয়। কৃশ্চান ও সেমেটিক ধর্মমতের দ্বন্দ্ব কবিতাটিতে আরো একটি নতুন মাত্রা যোগ করে, মেজাইকে আক্ষরিক অর্থেই আজকের পাঠকের পৃথিবীতে নামিয়ে আনে। উত্তর আফ্রিকার একটি বাড়িতে এলিয়ট এক রাত্রির অতিথি হয়েছিলেন, গৃহকর্ত্রী সেই রাতে এলিয়টের কবিতার বইয়ের

পাতা উলটে যেতে যেতে তাঁর অ্যানটি সেমেটিক মনোভঙ্গির পরিচয় পান এবং সেই মধ্যরাত্রেই তিনি ঘরের দরজার কড়া নেড়ে এলিয়টকে তখনই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন। মেজাই বেথলেহেমের দিকে যেতে যেতে গ্রাম নগরে যে বিরুদ্ধ অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন এ ঘটনা যেন তারই উল্টো পিঠ।

অনেকে বলবেন যে, এই শতকের দুয়ের দশকের আমেরিকায় ইহুদি বিরোধিতার যে হাওয়া উঠেছিল তার পটভূমিতে মেজাই রচয়িতা এলিয়টের অ্যানটি সেমেটিক মনোভঙ্গির সুবিচার হওয়া চাই। মেজাইতে তিনজন মিলে লিটার্জিক্যাল খৃষ্টবন্দনার যে পৃষ্ঠপট আছে তাও ইহুদিদের হাত থেকে পাওয়া। কৃশ্চানধর্মের যে একটি অভিনয়যোগ্য দিক আছে সে বিষয়ে ইংলণ্ডের যাজক সম্প্রদায় প্রথম থেকেই সচেতন। নবম দশম শতকে প্রশ্নোত্তর মূলক লাতিন সংলাপের মাধ্যমে মেজাই-এর প্রকরণ অভিনীত হয়েছে। মধ্যযুগের ইংলণ্ডে মিস্ট্রি প্লে ও মির‍্যাকল প্লে জাতীয় ধর্মীয় নাটকের অবিরল অভিনয় হয়েছে, তবু চার্চ ও রঙ্গমঞ্চের সম্পর্ক সব সময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক নয়। গরিবদের কৃশ্চানধর্ম লোকায়ত আঙ্গিকে মুক্তমঞ্চের অনুষ্ঠানে রঙ্গরসে ছড়িয়ে যেতে চেয়েছে, বড়োলোকদের কৃশ্চানধর্ম আবদ্ধ প্রকরণে চার্চের অঙ্গনে গম্ভীর ভারাক্রান্ত ও সংকীর্ণ হয়ে যেতে চেয়েছে। এই টানাপোড়েন চলেছে, চলেছিল। বিশ শতকের ইংরেজরা কিন্তু কৃশ্চানধর্মের সঙ্গে নাটকের যোগের কথা একরকম ভুলতে বসেছিলেন। এই সময় এভরিম্যান-এর ইংরেজি ভাষায় অভিনয় তাঁদের মনে আগ্রহ জাগাল। ক্যানটারবেরির ডিন এ বিষয়ে বিশেষ মন দিলেন, ১৯৩০ থেকে নিয়মিত বার্ষিক ধর্মীয় নাট্যের অনুষ্ঠান উপলক্ষে নতুন নতুন ধর্মীয় নাটক রচিত হতে শুরু করলো, ক্রমশ অভিনয়গুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। ইংলণ্ডে ধর্মীয় নাটকের নবজাগরণ আর এলিয়টের কৃশ্চান কবিতাগুচ্ছ রচনা তাই কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। ১৯৩৫-এ এলিয়টের মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল নাটক এই ক্যানটারবেরি উৎসবেই প্রথম মঞ্চস্থ হলো। ১৯২৮-এ ক্যানটারবেরির ডিন এই উৎসবে অভিনয়ের জন্য দ্য কামিং অব ক্রাইস্ট নাটকটি লিখতে মেসফিল্ডকে প্রেরণা দেন আর এর পরের বছর ঐ একই প্রসঙ্গ নিয়ে এলিয়ট মেজাই রচনা করেন। এর কয়েক বছরের মধ্যে ডরোথি সেয়ার্স দ্য ম্যান বর্ন টু বি কিং নামে যিশু জীবন নির্ভর এক শ্রুতিনাট্যপর্যায় রচনা করে বিশিষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

এলিয়টের মেজাই লেখার পাঁচ বছর পরে ১৯৩২-এর রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি মূল কবিতার নাম দ্য জর্নি অব দ্য মেজাই রেখেছেন, প্রথমের এই বাড়তি দি হয়তো ভুলে বসানো, হয় তো যে বই দেখে অনুবাদ করেছেন তাতে ছিল। এলিয়টের একগোছা কবিতা একসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পড়েছিল বোধ হয়। উপনিবেশের কবি

হলেও আধুনিক ইংরেজি কবিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আর বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। যেমন হয়ে থাকে, তাঁর তরুণ বয়সের প্রিয় ইংরেজ কবিদের নিয়ে তাঁর বেশ চলে যাচ্ছিল। যা চিরকালের তাই হলো সত্যিকারের আধুনিক, এই মতে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই এলিয়টের কবিতার নির্ভরে তিনি যখন আধুনিক কাব্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন তখন তাঁর দেখানোর বিষয় হলো এসব কবিতায় শাশ্বত আধুনিকতা নেই। চিত্রায় রবীন্দ্রনাথ কেরানির ছবি এঁকেছিলেন, বন্ধুর নিষেধে তা আবার কেটেও দিয়েছিলেন। পুনশ্চতেও হরিপদ কেরানি আছে, কিন্তু তার পাশেই আছেন আকবর বাদশা, তাই মিস্টার প্রুফ্রকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বনিবনা হবে না এ জানা কথা। এলিয়টের প্রেল্যুডস ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রেল্যুডের মতো তাঁর ভালো লাগলো না স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু ১৯১৭ তে এলিয়ট যেখানে ছিলেন ১৯২৭-এ তিনি সেখানে নেই, তাঁর ভরকেন্দ্র পালটে গেছে, একথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন না। আগেকার কবিতার তুলনায় এলিয়টের মেজাই যে ভাবে ভাষায় আলাদা তা রবীন্দ্রনাথের নজর এড়িয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথকে এসব খোঁজখবর অমিয় চক্রবর্তী বেশি দিতেন, কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর প্রিয় কবির নাম এলিয়ট ছিল না। সরল গভীর আন্তরিকতার গুণেই হয়তো মেজাই রবীন্দ্রনাথের মন জয় করেছিল।

এমন হতে পারে যিশুখৃষ্টের কথা থাকায় কবিতাটি তাঁকে বেশি টেনেছিল। আর্যামি অপছন্দ করলেও রবীন্দ্রনাথ সেমেটিক ছিলেন না। বড়োদিনের শান্তিনিকেতনে আচার্যরূপে তিনি ভাবণ দিয়েছেন, খৃষ্ট তাঁর একাধিক কবিতার প্রসঙ্গ। তাঁর বন্ধু দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও এবিষয়ে কবিতা লিখেছেন। ব্রাহ্ম ধর্মকে অনেকে প্রচ্ছন্ন কেরেস্তানি বলতেন, ধর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত এলিয়টের মতো স্পষ্ট করে জানা যায় না। এলিয়ট রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ভেবেছেন ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলেও সেই ধর্মীয় কাব্যপাঠে কোনো বাধা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গীতা বিষয়ে কিছু বলেন নি আর এলিয়টের কাছে গীতা এক সেরা দার্শনিক কাব্য। বোদলেয়ারের কবিতা এলিয়টের প্রিয়, রবীন্দ্রনাথের তা ভালো লাগেনি। এলিয়টের উপনিষদ অনেকটাই দেখানোপনা, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা গহন দীক্ষার মন্ত্র। সব শেষে বলতে হয় বিষ্ণু দে তাতিয়ে না দিলে রবীন্দ্রনাথ হয়তো এ কবিতা অনুবাদ করতেন না। অনুবাদ ব্যাপারটা সম্পর্কেই তাঁর ধারণা ভালো ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা অনুবাদটির নাম দিয়েছেন তীর্থযাত্রী। মেজাই যাত্রা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মানসিকতা তীর্থযাত্রীদের নয়। স্থাবর তীর্থ বেথলেহেম নয়, জঙ্গম তীর্থ যিশুখৃষ্টের দিকে তাদের যাত্রা। অনুবাদ আপাতত মূলের অনুগত বলা যায়। তেতাল্লিশ পংক্তি ইংরেজি কবিতা বাংলায় ছেচল্লিশ পংক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেজাই-এর শুরুতে উদ্ধৃতি দেওয়া পাঁচ পংক্তি ছিল,

অনুবাদের সময় রবীন্দ্রনাথ তা তুলে দিয়েছেন। কবিতা লেখার সময় বাইবেল ও ঐজাতীয় ধর্মপুস্তকের পংক্তি অবিকল তুলে দেওয়া এলিয়টের স্বভাব ছিল, পরে গ্রীক কবি সেফেরিস আর রুশ কবি ব্রদস্কির কবিতায় এই ধরনটি দেখা গেছে। এলিয়ট এঁদের দু'জনের আদর্শ। এলিয়ট সতেরো শতকের এক ক্রুশ্চান তাত্ত্বিক ল্যান্সলট অ্যানড্রুজের ধর্মীয় গদ্য প্রায় একরকম রেখে পাঁচ পংক্তির গদ্যকবিতায় ভেঙে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই পাঁচ পংক্তিকে চার পংক্তিতে গুটিয়ে এনেছেন। লিপিকার কথা বাদ দিলে পুনশ্চ রবীন্দ্রাথের প্রথম গদ্য কবিতার বই, তীর্থযাত্রী কবিতা এই পুনশ্চ বইতেই আছে, শিশুতীর্থও আছে, তবু গদ্য কবিতায় তাঁর তেমন হাত খোলে নি, যাকে বলে গদ্যকবিতা সারা জীবনে তিনি তা দুটি একটির বেশি লেখেন নি, তাঁর গদ্য-কবিতা আসলে অমিল মুক্তক বন্ধে লেখা অনতিনিরূপিত পর্বে ভাঙা মিশ্রবৃত্ত ছন্দোরীতির কবিতা, আর অন্যদিকে গদ্যকবিতা মেজাই-এর যোগ্য বাহন; রবীন্দ্রনাথ এই ঘাটতি ও আড়ষ্টতা পুষিয়ে দিতে চেয়েছেন অন্যভাবে :

কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা,
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সব চেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জয় শীত।

দেখা যাচ্ছে ধ্বনিসাম্যের সূত্রটি তিনি কাজে লাগিয়েছেন : কনকনে ঠাণ্ডা। বৈচিত্র্যের জন্য প্রতিশব্দ ব্যবহার করছেন : যাত্রা, ভ্রমণ। মিল পংক্তির শেষে নেই তাই পংক্তির মধ্যে বুনে দিচ্ছেন : ঘোরালো, ধারালো। ভ্রমণ-বিষম-সময়। অকারণে বাড়তি শব্দ ব্যবহার করছেন : ওয়েদার শার্প-এর বাংলা হয়েছে : ধারালো বাতাসের চোট।

বিরূপতা অনুভব করলেও মেজাইতে এলিয়ট ইন্দ্রিয়গত কামনার ছবিটি খররেখায় তীব্র করে এঁকেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তীর্থযাত্রীদের স্মৃতিচারণে সেই ইন্দ্রিয়সুখের অনুভব তীব্রতর হয়ে আসে নি, বরং বাংলা ভাষার স্বভাবদোষে মরে মিইয়ে এসেছে। অ্যাণ্ড দ্য সিল্কেন গার্লস ব্রিংগিং শেরবেট। রবীন্দ্রানাথ এর বাংলা করেছেন : আর শরবতের পেয়ালা হাতে রেশমি সাজে যুবতীর দল এ প্রি-র‍্যাফেলাইটের আঁকা ছবি মনে করিয়ে দেয়, এলিয়টের কবিতা মনে করায় না। শেরবেটে বরফদেওয়া শীতলতার যে অনুভব তা শরবতে স্বাভাবিকভাবে নেই। মেয়েদের হাতে 'পেয়ালা' তুলে দিয়েছেন ছবিটি সম্পূর্ণ করা জন্য, কিন্তু শরবতের ব্যঞ্জনা যথেষ্ট ছিল; সিল্কেন গার্লস এর বাংলা রেশমি-সাজে-যুবতী করেছেন ইচ্ছা ক'রে। এদের ত্বক রেশমের মতো, সম্ভবত এলিয়ট এই বোঝাতে চেয়েছিলেন। অ্যাণ্ড রানিং অ্যাওয়ে, অ্যাণ্ড ওয়ান্টিং দেয়ার লিকার অ্যাণ্ড য়োমেন। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন : ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে। স্থূলতার সেই পার্থিব জোর এ অনুবাদে

নেই। অনুরূপ ভাবে : অ্যাণ্ড ফিট কিকিং দি এম্‌টি ওয়াইনস্কিনস। এর বাংলা করেছেন : পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো। কিকিং-এর বাংলা ঠেলছে খুবই দুর্বল শোনায়।

এলিয়টের মেজাই কবিতায় অ্যাণ্ড এই সংযোজকটি চব্বিশবার এসেছে। অন্বয়ের এই শৃঙ্খল মেজায়ের অভিজ্ঞতাকে বিধিবদ্ধ করেছিল, তার মধ্যে বাইবেলের গঠন রীতি এনে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে যতদূর পারেন ঐ সংযোজক পরিহার করেছেন। ইংরেজির ব্যাকরণ স্বাচ্ছন্দ্য বাংলায় নেই, গদ্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ আড়ষ্ট—এসব কথা মনে রাখলেও বাংলা শব্দে মূর্ত অভিজ্ঞতার বিশৃঙ্খলা আগে চোখে পড়ে। চাক্ষুষ ক্ষেত্রেও মেজাই কবিতাটির পৃষ্ঠার একধার ঘেঁষা যে একটানা বিন্যাস তা রবীন্দ্রনাথ ক্ষুন্ন করেছেন—এখানে একপেশে মুদ্রণের বদলে আলপনার মতো এলোমেলো পংক্তি সাজানো রয়েছে।

রূপদক্ষ এলিয়ট জানতেন শিল্পে উপস্থাপনের নিপুণতা না থাকলে শিল্পীর ব্যক্তিগত সততা অর্থহীন। তাঁর মেজাই তাই তিন স্তবকে বিভক্ত। পাপ-বোধে অপরাধবোধে আক্রান্ত মেজাই-এর স্বীকারোক্তি মূলক কথন যাত্রা করা, উপনীত হওয়া, বিশ্বাস ও সংশয়ে দোলাচল হওয়ার তিনটি পর্বে ভাগ করা। একই প্রকার ধর্মীয় থিম নিয়ে লেখা এবং আগে ইংরেজিতে লেখা ও পরে বাংলায় অনুবাদ করা পুনশ্চর অন্তর্গত গদ্যকবিতা শিশুতীর্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যাত্রা, সংশয় ও উপনীত হওয়ার এই তিনটি পর্ব রেখেছেন। কিন্তু এখানে তিনি তিনটি স্তবককে দুটি স্তবক করেছেন, শেষ দুটি স্তবক এক হয়ে গিয়েছে। তা হওয়া উচিত ছিল না।

পুনরুক্তির অর্থহীন ঝোঁকে অনুবাদ কবিতার কশেরুকা আলগা হয়ে গিয়েছে। এলিয়টের মেজাইতে সচেতন পুনরাবৃত্তি ছিল। পাঠক লক্ষ করেন প্রথম পংক্তির এ কোল্ড কামিং উই হ্যাড অব ইট ঐ একই স্তবকের শেষের দিকে একটি একটি অভিজ্ঞতার একককে কিভাবে সম্পূর্ণ করেছে : এ হার্ড টাইম উই হ্যাড অব ইট। আর দ্বিরুক্তি তীর্থযাত্রীর অভিঘাত শিথিল করে দিয়েছে :

১ কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা
২ গনগন করে রাগে
৩ মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে
৪ মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে
৫ আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে
৬ সেখানে বরফসীমার নিচেটা ভিজে ভিজে
৭ যেতে যেতে সন্ধে হলো
৮ সময় পেরিয়ে যায় যায়
৯ এলেম ফিরে আপন আপন দেশে

১০ ঘন গাছগাছালির গন্ধ
১১ আর কিন্তু স্বস্তি নেই সেই পুরোনো বিধিবিধানে
১২ যার মধ্যে আছে সব অনাত্মীয় দেবদেবী আঁকড়ে ধরে

দ্বিরুক্তিপ্রবণ এ অনুবাদ বাংলাভাষার মুদ্রাদোষ অঙ্গীকার করে পাঠযোগ্য হয়ে উঠলেও এলিয়টের মেজাযের একটি মূল প্রত্যয়কে ক্ষুন্ন করেছে। এলিয়টে কথক একা কথা বলেছে, তিনজন মেজায়ের হয়ে কথা বলেছে। এলিয়ট একা বলেছেন, এলিয়ট সবে দীক্ষিত সব মানুষের একই সঙ্গে অনুভব করা সংশয় ও বিশ্বাসের কথা বলেছেন। তাই এ কবিতায় আই এবং উই, আমি এবং আমরার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে আমি-আমরার কোনো প্রভেদ রাখেন নি। বাংলা বাক্যগঠনের পুরো সুযোগ নিয়ে আমি-আমরা জাতীয় সর্বনাম প্রায় পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন। এর ফলে অকারণ ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে/আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে। মূলে ছিল: স্লিপিং ইন স্ন্যাচেস। তিনজন মেজাই পালা করে ঝিমিয়ে নেবে—এর এমন একটা অর্থ হতে পারে। উইদ দ্য ভয়েজেস সিংগিং ইন আওয়ার ইয়ার্স—এখানে ভয়েজেস স্পষ্টই অনেকের কণ্ঠস্বর। অথচ কেউ-বা বললে একজন বোঝায়, অনেকজন বোঝায় না।

এলিয়টের বিশ্বাস ছিল বড়ো কবির ক্ষেত্রে শিল্পিত অভিজ্ঞতা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে। এ কবিতায় তিনি নিজে সে বিশ্বাস রক্ষা করতে পারেন নি। এখানে তিনি এক নিশ্বাসে সেই অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন যা কৌম, সামাজিক, আনুষ্ঠানিক এবং একান্ত ব্যক্তিগত: উই হ্যাড এভিডেন্স অ্যাণ্ড নো ডাউট। আই হ্যাড সিন বার্থ অ্যাণ্ড ডেথ। এই পংক্তিটিতে উই এবং আই উভয় কর্তাই আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর বাংলা করেছেন: প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই।/এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও। অনুবাদে এই কর্তৃত্বহীন অভিজ্ঞতা কোনো তাৎপর্য নিয়ে আসে নি। ইংরেজির হরফের টোপোগ্র্যাফিক্যাল সুবিধা আদায় করে এলিয়ট বড়ো হাতের এবং ছোটো হাতের বি এবং ডি ব্যবহারের ফলে বার্থ এবং ডেথ এ কবিতায় দুটি করে তাৎপর্য পেয়েছে, তারা যথাক্রমে নির্বিশেষ জন্ম ও মৃত্যুর এবং বিশেষভাবে যিশুর জন্ম ও মৃত্যুর, নেটিভিটি ও প্যাসন প্লের প্রতীক ধরে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে সেই তাৎপর্য আরোপ করা যায় নি, কারণ বাংলা হরফে দ্ব্যর্থবোধের কোনো সুযোগ ছিল না। অভিযোগ করতে হয় যখন রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন: সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর। একটি পূর্ণচ্ছেদে নিরঞ্জন বাক্যটি সমাপ্ত হয়, বিরামচিহ্নের মধ্যে না জিজ্ঞাসার না বিস্ময়ের কোনো ইঙ্গিত থাকে না। অথচ মূলে জিজ্ঞাসা ছিল: ওয়্যার উই লেড ওল দ্যাট ওয়ে ফর বার্থ অর ডেথ?

শান্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ পূর্ণচ্ছেদে বাক্যটি সমাপ্ত করতে পারেন, কিন্তু,

এ প্রশ্ন সদ্যঃ দীক্ষিতের ভিত্তি ধরে টান দেয়, শান্তির প্রচ্ছদ খানখান করে ফেলে। মেজাই উপনীত হয়েছেন বটে, কিন্তু এ জন্ম যেন এখনো তাঁদের দ্বিজ করে তোলে নি, এ মৃত্যু এখনো তাঁদের অশৌচে রেখেছে। আর রবীন্দ্রনাথ যেন এর তাৎপর্য বোঝেন না। দেয়ার ওয়াজ এ বার্থ, সার্টেনলি। তিনি বাংলা করেন : জন্ম একটা হয়েছিল বটে। রবীন্দ্রনাথের এ অনুবাদে পাঠক বিমূঢ় বোধ করেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি সচেতনভাবে নির্দেশক টা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মেজাই যিশুর জন্মকে কিছুতেই একটা জন্ম বলতে পারেন না, এ একটি জন্ম, এক অদ্বিতীয় জন্ম, যার সংবাদ নিতে মেজায়ের নিরন্ত বিরুদ্ধ পথ পেরিয়ে আসা, এ একটি জন্ম যার প্রথম কান্নার সঙ্গে হেরদরাজার নির্দেশে নবজাতসন্তানহীনা হাজার মায়ের কান্না মিশে গেছে। না, যন্ত্রণা মা মেরির নয়, যন্ত্রণা মেজাইয়ের ; না, সে যন্ত্রণার অংশ রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঠককে দিতে পারেন নি। যে তিনটে প্রান্তিক গাছ দেখে এসেছিলেন মেজাই, দুপাশে দুটো চোর গেঁথে সেই তিনটে গাছেই যিশুদের ক্রুশে অর্পণ করা হয়েছিল ; যে শাদা ঘোড়াটা দৌড় দিয়েছিল, যিশু তাতে উঠেছিলেন ; যে শরাবখানায় মেজাই এসেছিলেন ; সেখানেই যিশুর জন্ম হয়েছিল ; তার কপাটের উপর তুলে দেওয়া যে আঙুরলতা সে দ্রাক্ষা খৃষ্ট নিজেই, যে মদের কুপো পড়ে ছিল তাতে ছিল ঈশ্বরের রক্ত ; পাশা খেলছিল যে ছজন তারা আসলে রোমান সৈন্য, তারা দান ফেলছিল যিশুর জোব্বা পাবে তাই ; তাদের টাকার লোভ সে তো জুদাসের লোভের মতো, যে কয়েকটা রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যিশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল। রূপকের চেয়ে বেশি কিছু এই সব অনচ্ছ ইঙ্গিতের আভা বাংলা অনুবাদে আসে নি। আনা প্রায় অসম্ভব ছিল, মূলের প্রতি আনুগত্যও সমান ছিল না। সিক্স হাণ্ডস-এর বাংলা করেছেন দুজন মানুষ। জন্ম একটা হয়েছিল বটে—এই উচ্চারণ সবচেয়ে বিচলিত করে। আরো বিস্মিত হতে হয় রবীন্দ্রনাথ অ্যাগনির বাংলা 'যাতনা' করেন দেখে। মনে রাখা দরকার এই কবিতা অনুবাদের আগে রবীন্দ্রনাথ বাভারিয়ায় গিয়ে ওবেরামমারগাউ-এর গ্রামীণদের দ্বারা প্রতি দশক অন্তর অভিনীত এবং অন্তত চারশো বছরের অভিনয়ের ঐতিহ্যবাহী য়োরোপের শ্রেষ্ঠ প্যাসন-প্লেটি দেখে এসেছেন এবং তার অভিঘাতে শিশুতীর্থ-এর মতো কাব্যরচনা করেছেন। শিশুতীর্থে কুমারসম্ভবের ছাপ বেশি না নেটিভিটির সে প্রশ্ন স্থগিত থাক। অ্যাগনি ও একসট্যাসির বাংলা হয় না বললেও প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া হয় : রবীন্দ্রনাথ কীভাবে অ্যাগনির বাংলা যাতনা করতে পারলেন ? তীর্থযাত্রীতে রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যার বদলে সন্ধে, ইচ্ছার বদলে ইচ্ছে, এলাম-এর বদলে এলেম করেছেন ; এভাবে উচ্চারণের শ্রেণী পালটে-দেওয়া শীলিত নাগরালিতে মেজায়ের বৃষ্টিধোয়া পাথর মুখ এমনিতেই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাতনা-র জন্য পাঠক প্রস্তুত ছিলেন না।

শব্দটি অবধারিত সখী-ধরো-ধরো ভাব নিয়ে আসে। এলিয়ট মেজাইদের মৃত্যুর কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে জীবন দেখালেন, সে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত শোভা রবীন্দ্রনাথ দেখাতে পারলেন না, তাই মেজাইয়ের উভযোজ্যতার অন্তিম উচ্চারণ রাবীন্দ্রিক অনুবাদে বিরোধাভাসের একটি খেলো চাতুরীতে পর্যবসিত হলো: আর একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি। মেজাই সে জন্ম দেখেছিলেন যা মৃত্যু চেয়ে বড়ো, সে মৃত্যু দেখেছিলেন যা জন্মের অধিক। এলিয়ট মেজায়ের শেষ স্তবকে সে অভিজ্ঞতা পাঠককে পাইয়ে দিতে পেরেছেন। তীর্থযাত্রী থেকে সে প্রাপ্তি নেই।

অনুবাদক রবীন্দ্রনাথের এবং বেশির ভাগ বাঙালি পাঠকের অক্রুশ্চান ধর্মমত কী এই কবিতা পাঠে ব্যর্থতার জন্য দায়ী? মহাখেরী সিমোন ওয়াইল এর উত্তরে না বলবেন। নিজে ইহুদি হলেও তাঁর এলিয়টকে বড়ো কবি বলে স্বীকার করতে বাধে নি। তিনি বলেছেন: গ্রীস ও রোমের মতো ইসরায়েলের ঐতিহ্যও এলিয়ট আত্তীকরণ করে নিয়েছেন। ওয়াইল বলেন: ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার দুটি পথ আছে। একটি জীবনে পুষ্পিত ফলিত হয়ে ঝুরি নামিয়ে শিকড় ছাড়িয়ে যাওয়া সমগ্রতার পথ, আরেকটা গাছটিকে নিভার করে শুদ্ধ রস বানানো, কৃচ্ছ্রতায় বহন করে নিয়ে যাওয়ার এবং বাহিত হওয়ার অপেক্ষা: মেজাইতে এ অপেক্ষার কথাও আছে, এ প্রতীক্ষা এলিয়টের কবিতার একটি কেন্দ্রীয় প্রত্যয়, এ প্রতীক্ষা সিমোন ওয়াইলেরও ধ্রুবপদ ওয়াইল কবিতা লিখতেন না। কিন্তু দুজন আধুনিক ইহুদি কবি, দুজনেই সোভিয়েত দেশে থেকে বামপন্থাবিমুখ, দুজনেই এলিয়টের নির্দেশমতো সংস্কৃতির সঙ্গে ক্রুশ্চানধর্ম মেলাতে গিয়ে বিপন্নতা বোধ করেছেন। এঁরা দুজন ওসিপ মান্দেলস্তাম এবং যোসেফ ব্রদস্কি। দুজনের মধ্যে ব্রদস্কির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলতে হবে। দুজনের মধ্যে ব্রদস্কি অপেক্ষাকৃত তরুণ, নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় সম্প্রতি বহু-আলোচিত, এলিয়টের সঙ্গে তাঁর কবিতারও অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এলিয়ট পড়বার জন্যও রুশ কবি ব্রদস্কি ইংরেজি শেখেন। এলিয়টের মৃত্যুর খবর পেয়ে অডেনের লেখা একটি শোককবিতার আদলে ব্রদস্কি ভর্সেস অন দ্য ডেথ অব টি. এস. এলিয়ট নামে এক এলিজি রচনা করেন। ব্রদস্কির কবিতাটি দীর্ঘ, তার থেকে প্রাসঙ্গিক একটি সনেট অনুবাদ করে দেওয়া হলো:

মেজাই. কোথায় তোমরা. তোমরা যারা যাও সব আত্মাপাঠ করে? এইখানে এসো আর উঁচু করে তোলো তাঁর প্রভার মণ্ডল। আতুর শরীর দুটি, চোখ মেলে রাখে তারা ভূমির উপরে। দুজনেই গায় আর দুজনের গান কী যে এক অবিকল! তারা কী কুমারী তবে? না কেউই নিশ্চিত জানে না: সংরাগে না, বেদনায় সুচিহ্নিত হয়ে আছে তাদের প্রত্যয়। অর্ধেক-সরিয়ে-রাখা একজন, আদম সে, আর অন্যজনা চুলের লহর দেখে বোঝা যায় তাই

তাকে ইভ মনে হয়।
আমেরিকা, সেখানেই জন্মেছেন, সেই স্থানে হয়েছেন বড়ো; এবং ইংলণ্ড, তাঁর সেইখানে মৃত্যু হলো: উভয়েই আজ তামস দুমুখ ঝুঁকে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে এক বঞ্চনায়; বিরাট সমাধি তাঁর; তারা পরস্পর দুইপাশে— আর্ত ও অনড়। এবং স্বর্গের দিকে ধীরগতি ভাসে সব মেঘের জাহাজ। প্রতিটি সমাধি তবু নির্ধারণ করে থাকে মর্ত্যসীমানায়।

এলিয়ট ব্রদস্কির প্রিয় কবি, তাঁর মেজাই ব্রদস্কির প্রিয় কবিতা, তাই এলিয়ট বিষয়ক শোক-কবিতায় ব্রদস্কি মেজাই-এর উল্লেখ করেছেন, এটকু বললে যথেষ্ট হবে না। বাইবেল, কৃশ্চান প্রার্থনা সংগীত, ডান ও অন্যান্য মেটাফিজিক্যাল কবি, দান্তে ও পাস্কাল: এলিয়টের যা যা ভালো লাগে তার প্রায় সবই ব্রদস্কির প্রিয়। এমনকি এলিয়টের দ্বারা প্রভাবিত গ্রীক কবি সেফেরিস, তাঁকেও ব্রদস্কির ভালো লাগে। তবু ব্রদস্কি সেমেটিক এবং এলিয়ট অ্যানটি সেমেটিক। মেজাই ব্রদস্কির নিজের জিনিশ, তিনি এলিয়টের কাছ থেকে হাত পেতে মেজাইকে নেন, এলিয়টের মৃত্যুর পর মেজাইকে ফিরিয়ে দিতে চান এলিয়টের কাছে। এলিয়টের কবিতায় বারবারই এক প্রবীণের কথা এসেছে: সে অনেক জানে তাই তার ক্ষমা নেই; তার নিজভূমি আছে তাই সে প্রবাসী; এলিয়টের লেখায় সে কখনো অন্ধ তাইরেসিউস, কখনো চল্লিশ বছরেই বুড়ো ঈগল; কখনো মেজাই, কখনো এলিয়ট নিজে। এলিয়টকে নিয়ে এলিজি লিখতে গিয়ে ব্রদস্কি তাই মেজাইকে ফিরিয়ে এনেছেন, মেজাই এলিয়টের আর্কিটাইপ। আমেরিকা পেরিয়ে ইংলণ্ডে এই মেজায়ের যাত্রা। অনাত্মীয় মার্কিনদের ফেলে অ্যাংলো-ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা তাঁর প্রধান প্রাপ্তি। কিন্তু মেজাই-এর মতো, মেজাই লেখার সময়কার এলিয়টের মতো, ব্রদস্কি এখনো দোলাচল। বাইবেলের ভ্রমণকারী ইহুদির চিত্রকল্প এখনো তাঁর রচনায় উঠে আসে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর আমেরিকায় ব্রদস্কি সম্মানজনকভাবে থাকতে পারবেন, খোলা হাওয়ার সোভিয়েত দেশ তাঁকে ফেরার নিমন্ত্রণ জানাবে। ব্রদস্কি জানবেন তাঁর কোথায় যাওয়ার কথা আছে, ব্রদস্কি জানবেন তাঁর কোথাও যাওয়ার নেই। মেজাই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলবেন:

We returned to our places, these kingdoms, But no longer at ease here,

সমালোচক টি. এস. এলিয়ট

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

এলিয়ট বলেছিলেন, কবি না হলে কাব্য সমালোচক হওয়া চলে না। এলিয়ট কবি ও সমালোচক হিসাবে সমানা খ্যাতি অর্জন করেছেন। আমেরিকান হলেও তিনি ইংল্যাণ্ডে ইংরাজ বলেই স্বীকৃত হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি আরভিং ব্যাবিট এবং জর্জ স্যান্টায়ানার (George Santayana) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি বহু মনীষীর কাছেই অঞ্জলিভরে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ইংল্যাণ্ডের দার্শনিক এফ. এইচ. ব্র্যাডলী এবং ফরাসী সিম্বলিস্ট পল ভালেরি, ম্যালার্মে, ভারলেইন, জুলস লাফোর্গ এবং র‍্যাঁবোর কাছে তাঁর বিরাট ঋণ। ফরাসী সমালোচক রেমি ডি. গুরমোঁর কাছেও তাঁর ঋণ কম নয়। হিউমও তাঁর উত্তমর্ণ। ম্যাথ্যু আর্নল্ড-এর মত তিনিও ইয়োরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন দেশের ভাবরসপুষ্ট মন নিয়ে তিনি সমালোচনায় ব্রতী হন।

এলিয়ট জীবনে শতশত প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা লিখেছিলেন। সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি ঠাঁই পেয়েছে The Sacred Wood, The Selected Essay এবং The Use of Poetry and the Use of Criticism প্রভৃতি গ্রন্থে। আর্নল্ডের উত্তরসাধক হলেও এলিয়ট সমালোচনার এক নতুন সুর নিয়ে এসেছিলেন। তিনি হিউম-এর কাছে শিখেছেন রোম্যান্টিক বিরোধী মনোভাব। মানুষের সংস্কৃতিতে ধর্মের স্থান যে খুবই বড় সে কথাও হিউমের কাছেই শিখেছিলেন। Image বা প্রতীকধর্মী চিত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা হিউম বারে বারে বলেছিলেন। এলিয়টও ঐ মতে বিশ্বাসী। এজরা পাউণ্ড-এর কাছেও এলিয়ট Image বা চিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে ঋণী।

আর্নল্ড সম্বন্ধে এলিয়ট লিখেছিলেন :

"Arnold—I think it will be conceded—was rather a propagandist than a critic, a popularizer rather than a creator of ideas. So long as this island remains an island ... the work of Arnold will be important." অর্থাৎ, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আর্নল্ড সমালোচকের চেয়ে প্রচারক বেশী ছিলেন। তিনি ভাবসম্পদ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং ভাবসম্পদ সৃষ্টি করতে পারেন নি। তবু তার সমালোচনার প্রচুর গুরুত্ব রয়েছে। এখানে এলিয়ট-এর সুর খুব প্রশংসাত্মক নয়। কিন্তু আর্নল্ডের কাছে তার বহু বিষয়ে

ঋণ। আর্নল্ডের রচনাশৈলীর সঙ্গে তার বিস্ময়জনক মিল। দুজনেই নীতিবাদী, দুজনেই ধর্মপরায়ণ, দুজনেই সংস্কৃতির একান্ত ভক্ত। আর্নল্ড তাঁর Culture and Anarchy গ্রন্থে সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এলিয়টও বিশ্বাস করেছেন, সাহিত্যের পথে সংস্কৃতির উত্তরণ। তবে এলিয়ট নীতির চেয়ে ধর্মের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েছেন। সাহিত্যে বা জীবনে কলাকৈবল্যবাদকে তাঁরা দুজনেই সযত্নে পরিহার করেছেন। এলিয়ট লিখেছিলেন : "Criticism must always profess an end in view which roughly speaking appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste." অর্থাৎ, সমালোচনার সর্বদাই একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকবে। সে উদ্দেশ্য হল, শিল্প ও সাহিত্যের বিশ্লেষণ এবং মানুষের রুচির উন্নয়ন। আর্নল্ড তাঁর সমগ্র জীবন ধরে ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের রুচির উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি গভীর বেদনা অনুভব করেছেন যে, ইংরাজ জাতি উপকরণের দুর্গ রচনা করে চলেছে, কিন্তু তাদের আত্মা বুভুক্ষু, তাদের মন শিশ্নোদরপরায়ণ। আর্নল্ড ও এলিয়ট দুজনেই ক্ল্যাসিকাল মনোভাব সম্পন্ন। দুজনেই ফরাসী সংস্কৃতির অনুরাগী। আর্নল্ড রাজনীতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে Liberal বা উদার মনোভাব সম্পন্ন। এলিয়ট কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজভক্ত বা royalist.

এলিয়ট কিন্তু আর্নল্ড-এর 'Criticism of life' গ্রহণ করেন নি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'emotion recollected in tranquillity'-তেও তাঁর বিশ্বাস নেই। কবিতায় মানুষের মন উন্নত হয়। কিন্তু আর্নল্ডের সংজ্ঞায় মন হিমশীতল হয়ে ওঠে। এলিয়ট মনে করেন যে কবিতায় কোন প্রেরণার প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিত্বের ছাপও সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কবিতা রচনা করতে হবে পরিশ্রম করে। কবিতার উদ্দেশ্য হবে উত্তম গদ্য হওয়া। সে জন্যই তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিতার অনুরাগী। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, আর্নল্ড বলেছিলেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিতা গদ্য, কবিতা নয়। এলিয়ট মনে করেন যে, কবিতার সঙ্গে মনের বিশেষ যোগ নেই। কুম্ভকার যেমন মৃন্ময় মূর্তি গড়েন, কবি ঠিক সেরূপ কবিতা রচনা করেন নানারূপ উপাদানের সাহায্যে। সুতরাং কবিতা একটি Craft মাত্র।

এলিয়ট বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন যে, ইংরাজী সাহিত্য সমালোচনার একটি tradition বা ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার প্রতি কারুর দৃষ্টি নেই। অধিকাংশ ইংরাজ লেখকের সমালোচনা impressionistic বা নিজের মনের মাধুরী দিয়ে সব কিছুর বিচার। তাই এলিয়ট চেয়েছিলেন, ব্যক্তিগত impression বর্জন করে কতকগুলি সাহিত্যতত্ত্ব নির্ধারণ করতে হবে। রোম্যান্টিক কবি ও সমালোচকরা নিজেদের ব্যক্তিত্বকেই চূড়ান্ত বলে মনে করেছিলেন। তাই tradition বা ঐতিহ্যের দিকে তাঁরা, দৃষ্টিপাত করেন নি।

রোম্যান্টিকতার মাপকাঠি দিয়ে তাঁরা শেক্সপীয়ার এবং অন্যান্য কবির বিচার করেছেন। তাই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিতা অপাংক্তেয় হয়ে রইল। এলিয়ট রোম্যান্টিক সাহিত্য ও সমালোচনাকে বিরাট গৌরবোজ্জ্বল Tradition এর অন্তর্ভুক্ত করেন। ব্যক্তিকে ঐতিহ্যের সঙ্গে গ্রথিত করতে হবে। ইয়োরোপের একটি সার্বজনীন মন আছে। সেই মনের ওপর যুগ যুগ ধরে বহু দার্শনিক ও সাহিত্যিকের ভাবধারায় ছাপ পড়েছে। তাকে কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। একটি শিল্পকৃতি বা কাব্যকে বিচার করতে হলে দেখতে হবে তা কতটা ঐতিহ্যের অনুগামী। তার সঙ্গে প্রয়োজন শিল্পকৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। তিনি বলেছেন:

"I thought of literature then, as I think of it now, of the literature of the world, of the literature of Europe, of the literature of a single country, not as a collection of the writings of individuals, but as 'organic wholes,' as systems in relation to which, and only in relation to which, individual works of literary art, and the works of individuals, have their significance." অর্থাৎ আমি তখনও সাহিত্য সম্বন্ধে যা মনে করতাম এখনও তাই করি। পৃথিবীর সাহিত্য, ইয়োরোপের সাহিত্য বা একটি দেশের সাহিত্য বহু লোকের বিচ্ছিন্ন রচনার সমাবেশ নয়—তা অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন। একেই বলে tradition শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সমালোচনার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। তাই তিনি বলেছেন:

"It is part of the business of the critic to preserve tradition—where a good tradition exists. It is part of his business to see literature steadily and to see it whole; and this is eminently to see it not as consecrated by time, but to see it beyoud time; to see the best work of our time and the best work of twenty five hundred years ago with the same eyes. It is part of his business to help the poetaster to understand his limitations. The Poetaster who understands his limitations will be one of our useful second order minds, a good minor poet (some thing which is very rare) or another good critic."

অর্থাৎ সমালোচকের অন্যতম উদ্দেশ্য ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হওয়া। তিনি সাহিত্যকে অবিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড হিসাবে দেখবেন। কাল-পূত হলেই চলবে না, সাহিত্যকে কালোত্তীর্ণ রূপে দেখতে হবে। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে একই দৃষ্টি নিয়ে

দেখতে হবে। সমালোচকের আর এক কর্তব্য, নিম্ন শ্রেণীর কবিকে তাঁর দোষত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত করে দেওয়া। নিম্ন শ্রেণীর কবি যদি তাঁর ভুলত্রুটি বুঝতে পারেন, তবে তিনি ক্রমশ মাঝারি শ্রেণীর কবি এবং উত্তম সমালোচক হতে পারেন।

এলিয়ট সমালোচক হিসাবে বড়ই কঠোর। তাই তিনি তাঁর The Imperfect Critic এবং The Perfect Critic প্রবন্ধে বহু মহারথীকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ম্যাথু আর্নল্ড, আর্থার সাইমনস, এমন কি কোলরিজ পর্যন্ত Imperfect critics রূপে পরিগণিত। এলিয়ট-এর মতে অ্যারিস্টটল এবং রেনী ডি গুরমোঁ-ই পূর্ণতার পথে, কিন্তু পূর্ণ নন।

তাই সমালোচক ও সাহিত্যিককে ঐতিহ্য মানতে হবে। কারণ কোন কবি বা শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য নেই। শিল্পী বা কবির মূল্য নির্ধারিত হবে অতীত যুগের শিল্পী ও কবিদের মূল্যায়নের মাপকাঠিতে। এটা অনেকটা ক্রিকেট খেলার মত। সমগ্র টীম-এর ওপর সব কিছু নির্ভর করে। একজন খেলোয়াড় দু'শ রান করলেও কিছু এসে যায় না। সুতরাং মৃত শিল্পীদের সংগে তাঁকে তুলনা করতে হবে। এটা সৌন্দর্যতত্ত্বের কথা, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগীর কথা নয়। আর্নল্ড বা এলিয়ট-এর ঐতিহাহিক দৃষ্টিভংগী ছিল না।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। কবিকে সেই ধারায় অবগাহন করতে হবে। সেই কুহেলী গুণ্ঠনে ঢাকা অতীত থেকে ঐতিহ্যের ধারার শুরু, তার শেষ নেই। তার আদি আছে, অন্ত নেই। কবি নৈর্ব্যক্তিকভাবে সেই ঐতিহ্যের ধারক।

"The progress of an artist is continual self sacrifice, a continual extinction of personality. It is in this depersonalization that art may be said to approach the condition of science," অর্থাৎ, শিল্পীকে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হবে। ক্রমশ ব্যক্তিত্বের ক্ষয় হবে। যখন শিল্পী সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক হতে পারবেন তখনই শিল্পকৃতি বিজ্ঞানের পর্যায়ে এসে পৌঁছবে। আবার আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন :

"Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion ; it is not the expression of personality, but an escape from personality." অর্থাৎ, কবিতা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের প্রকাশ নয়। কবিতার মাধ্যমে কবি আবেগ ও ব্যক্তিত্ব থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হবেন। কবির কথা না ভেবে সমালোচককে কবিতার কথা ভাবতে হবে। তাতেই কবিতার উৎকর্ষ ভালভাবে বোঝা যাবে। অনেকেই কবিতার মূল্যায়নে দেখেন কবির অকপট আবেগ তাতে কতটুকু আছে। অল্প সংখ্যক লোক কবিতাটির গঠন নৈপুণ্য উপলব্ধি করতে পারেন। তার চেয়েও

কম সংখ্যক লোকই কবিতাটির মধ্যে যে আবেগটি অন্তর্নিহিত তা উপলব্ধি করতে পারেন। 'কবিকে নয়, কবিতাকে আলোচনা কর'—এই হল এলিয়ট-এর বাণী। কবিতাই তো একটি সমগ্র শিল্পকৃতি। কবিতার গঠন বা Structureই আসল কথা।

কবিতা রচনার বিষয়ে এলিয়ট দুটি সুন্দর কথা বলেছেন—Unification of Sensibility এবং Dissociation of Sensibility. কবির জীবনের বহু অভিজ্ঞতা এক সঙ্গে গ্রথিত ও সুসংহত হওয়া প্রয়োজন। মেটাফিজিক্যাল গোষ্ঠীর কবি, বিশেষ করে জন ডান-এর কাব্যে হৃদয় এবং মস্তিষ্ক, আবেগ এবং বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার সমন্বয় দেখা যায়। এই সমন্বয়কে এলিয়ট বলেছেন Unification of Sensibility. কিন্তু যদি সেই অভীষ্ট সমন্বয় অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে বলা হবে Dissociation of Sensibility. মিল্টন থেকে আরম্ভ করে রোম্যান্টিক যুগের সকল কবিই অসার্থক এই কারণে যে, তাঁদের Unification of Sensibility-এর একান্ত অভাব। কিন্তু ডান বা হার্বার্ট-এর কবিতায় চিন্তা ও আবেগের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রসঙ্গে এলিয়ট-এর Objective Correlative তত্ত্বটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন :

"The only way of expressing emotion in the from of art is by finding an 'Objective correlative'; in other words, a set of objects a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when external facts, which must terminate the sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked. If you examine any of Shakespeare's more successful tragedies, you will find this exact equivalence; you will find that the state of mind of Lady Macbeth walking in her sleep has been communicated to you by a skilful accumulation of imagined sensory impressions; the words of Macbeth on hearing of his wife's death strike us as if, given the sequence of events, these words were automatically released by the last event in the series. The artistic 'inevitability' lies in this Complete adequacy of the external to the emotion; and this is precisely what is deficient in Hamlet."

অর্থাৎ, আর্টের ক্ষেত্রে আবেগ প্রকাশ করতে হলে শিল্পীকে 'objective correlative' খুঁজে বার করতে হবে। একটি বিশেষ ঘটনা বা ঘটনাবলী হল ঐ বিশেষ আবেগটির ব্যাখ্যা বা formula. বাহ্যিক ঘটনাটি উপস্থাপিত

করলে তৎক্ষণাৎ আবেগের উদ্রেক হবে। শেক্সপীয়ারের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলির পর্যালোচনা করলে এই কথার যথার্থতা প্রমাণ হবে। লেডি ম্যাকবেথ যখন রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় হেঁটে বেড়াতেন তখন তাঁর মনের অবস্থা পাঠক ও দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারে কতগুলি কাল্পনিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছাপ বা impression-এর দ্বারা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ম্যাকবেথ যে কথা বলেছিলেন তার আবেদন আমাদের মনের কাছে রয়েছে এই কারণে যে সেই কথাগুলি ঘটনার শেষ পর্যায়ে উচ্চারিত। আবেগ ও বাহ্যিক ঘটনা সমান সমান হলেই শিল্পকৃতি সার্থক। কিন্তু হ্যামলেট নাটক অসার্থক। কারণ হ্যামলেট এমন একটি আবেগের দ্বারা অভিভূত যে তা প্রকাশ করা যায় না। যে ঘটনার জন্য তিনি অভিভূত তাতে অতটা অভিভূত হওয়া শোভন নয়। হ্যামলেটের মা পিতৃঘাতী কাকাকে বিবাহ করেছেন। হ্যামলেট-এর কাছে সমস্ত পৃথিবী শ্মশানভূমি। সেখানে আলো নেই. বাতাস নেই, সুস্থ জীবনের এতটুকু চিহ্ন নেই। তাই বারে বারে তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন। এতখানি আবেগ থাকা কী ঠিক, এই প্রশ্ন এলিয়ট করেছেন।

এলিয়ট বলেন যে, আবেগ এবং বাইরের ঘটনা বা object কবিতা ও নাটকের মধ্যে একাত্মীভূত হয়ে যাবে। অর্থাৎ আবেগ বা Subjective অবস্থাটির বাইরের ঘটনা বা objective ঘটনাটির সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক বা Correlative থাকা চাই। মিল্টনের Samson Agonisies নাটকটির পর্যালোচনা করলে Objective Correlative ভাল করে বোঝা যেতে পারে। মিল্টন ছিলেন পিউরিটান দলভুক্ত। তাঁদের সঙ্গে স্বৈরাচারী রাজার দল, অর্থাৎ ক্যাভালিয়ারদের নিত্যবিরোধ। পিউরিটান দলের অন্তরের কামনা ছিল রাজতন্ত্র ধ্বংস করে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। মিল্টন ছিলেন আদর্শবাদী। আদর্শের জন্য তিনি প্রাণ-পর্যন্ত বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন। প্রাণ বিসর্জন তাঁকে দিতে হয় নি। কিন্তু চোখ দুটি বিসর্জন দিতে হল। তিনি বিবাহ করেছিলেন শত্রুপক্ষের মেয়ে মেরী পাওয়েলকে। স্ত্রীর জন্য তাঁকে বহু দুঃখ পেতে হয়েছিল। রাজা দ্বিতীয় চার্লস ও ক্যাভলিয়ারের দল যখন আবার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তখন অন্ধ মিল্টনকে কারারুদ্ধ করা হয়। মিল্টনের যখন এরূপ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করতে হচ্ছে, তখন তাঁর মনে বাইবেল-বর্ণিত মহাপুরুষ স্যামসনের কথা মনে হল। স্যামসন ছিলেন ইজরাইলাইট সম্প্রদায়ভুক্ত ঈশ্বর-প্রেরিত আদর্শবাদী পুরুষ। তিনি প্রেমার্ত হয়ে বিবাহ করেন শত্রুপক্ষের মেয়ে ডেলাইলাকে। ডেলাইলার জন্যই তাঁকে শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হতে হল। তাঁর চোখ দুটি উপড়ে ফেলা হল। তাঁর আর লাঞ্ছনার অবধি রইল না। মিল্টন-এর জীবনের সঙ্গে স্যামসনের বহু সাদৃশ্য দেখা যায়। তাই মিল্টন তাঁর মনের দুঃখ বা Subjective Suffering and emotion-এর একটি Objective counterpart খুঁজেছিলেন। নিজের দুঃখকে objectify

করতে চেয়েছিলেন। Subjective Correlated হল Objective-এর সঙ্গে। তাই মিল্টন একটি মহৎ শিল্পকৃতি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

Archetype নিয়ে অনেক সমালোচকই বর্তমানে ব্যাপৃত আছেন। তাই এ সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসংগিক হবে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন যুগ পর্যন্ত বহু পুরাণ (Myth) এবং রূপকথার (Legend) সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটি পুরাণ এবং রূপকথা রূপক বা প্রতীকধর্মী। ইতালীয় সমালোচক ভিকো এবং জার্মান সমালোচক হার্ডার পুরাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে ভিকো বলেছেন যে, কবিতা ও পুরাণ সম-অর্থবোধক। আর্নেস্ট ক্যাসিরার (Ernst Cessirer) কবিতা ও পুরাণের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। Archetype এবং Myth নিয়ে আধুনিক যুগে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন মড্ বড্‌কিন (Maude Bodkin)। তিনি সেইসব চিত্রকে archetype বলেছেন যা অতীত ও বর্তমান যুগের কাব্যেই বর্তমান। রহস্যময় গুহা, ঝর্না, সমাধিস্থ শস্য এবং অপরাধ-তাড়িত পথিক—এই সব চিত্রকে তিনি archetype বলেছেন। কবিতার যে সকল প্রতীক ব্যবহৃত হয় তিনি তার সংগে আদিম যুগের আদিবাসীদের ব্যবহৃত প্রতীকের তুলনা করেছেন। তাই তিনি যে সকল প্রতীকধর্মী চিত্রের উল্লেখ করেছেন তা সর্বদেশের, সর্বকালের। মনস্তাত্ত্বিক ইয়ুং-এর (Jung) এই বিষয়ে অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলা কবিতায় এলিয়টের অভিঘাত

শুদ্ধশীল বসু

টি. এস, এলিয়ট এবং বহুলাংশে এজরা পাউণ্ড-এর বাংলা কবিতায় অনুপ্রবেশ তিনের দশকে। এই প্রবেশ আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অতি তাৎপর্যময় ঘটনা। পাঁচের দশকের কবিদের মধ্যে এ্যালেন গীন্‌সবার্গ কলকাতায় এসে তরুণ কবিকুলে কিছু হইচই ফেলেছিলেন; মুখ্য অনেক তরুণ কবিদের (এখন অনেকেই তাঁরা প্রথিতযশা) লেখার মধ্যে, জীবনধারার মধ্যে, তাঁর ছাপ আমরা খুঁজে পেয়েছিলুম, কিন্তু তাতে আদেখ-লাপনার মাত্রাটা একটু বেশি ছিল, আমরা সত্যি যাকে 'অভিঘাত' বলে থাকি তা বাংলা কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্ত একটি passing phase-বই কিছু নয়। গীন্‌সবার্গ প্রসঙ্গ এই জন্যই আনলাম কারণ এই মার্কিন বীটনিক কবি বাংলা কবিতার শিকড়ে প্রবেশ করেননি যেমনটি ক'রেছিলেম এলিয়ট ও পাউণ্ড।—এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ব'লে নিতে চাই 'অভিঘাত' বা 'প্রভাব' মানেই নকল নয়। কিছুকাল পূর্বেও অমুক কবির ওপর তমুক কবির প্রভাব প'ড়েছে বললেই প্রভাবিত কবি ও তাঁর চ্যালাচামুণ্ডারা ছাতা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন, সেই মূর্খামিটা এখন কিছুটা গেছে, অন্ততঃ ততটা প্রকট নয়। সাহিত্যের ইতিহাস নাড়লে দেখা যাবে এমন অনেক মহৎ কবি সৃষ্টি হয়েছেন, মহৎ কবিতার সৃষ্টি হ'য়েছে, যার সুতো ধ'রে টান দিলে বেরিয়ে পড়বে এক অতি মাঝারি ধরনের কবির কবিতার অনুপ্রেরণা। বোদলেয়ার কী গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন মার্কিন কবি ও গল্পকার এডগার এ্যালেন পো'র দ্বারা। —তাতে বোদলেয়ারের মহত্ব কোথাও কি ছোটো হয়েছে? —বিষ্ণু দে তো তিন ও চারের দশক একেবারে এলিয়টময় ছিলেন; বুদ্ধদেব বসুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'যে আঁধার আলোর অধিক'-তো বোদলেয়রকে আত্তীকরণের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ-প্রসঙ্গে স্বয়ং এলিয়টই চমৎকার বলেছিলেন: কাঁচা কবিরা নকল করেন; বড় কবিরা করেন চুরি; বাজে কবিরা যা নেন তা নষ্ট করেন; আর প্রকৃত ভালো কবিরা যা গ্রহণ করেন তাকে আরো সুন্দর ও বর্ণময় ক'রে তোলেন (কয়লা থেকে হীরে বের ক'রে আনেন)। এলিয়ট আরো বলছেন, তিনিই সত্যিকারের ভালো কবি যিনি তাঁর চুরির ধন তাঁর ব্যাপ্ত চিন্তাধারার মধ্যে এমনভাবে বপন করেন যা অভূতপূর্ব এক অন্য বস্তুতে পরিণত হয়, কিন্তু ব্যর্থ কবি তিনিই যিনি এমনভাবে তাঁর চুরির মালমশলা ছেটান তাঁর কবিতায় যার কোনো মাথামুণ্ড নেই। তিরিশের দিকপাল কবিরা এলিয়ট ও কিছুটা পাউণ্ডকে সত্যিকারের ভালো কবির মতই

নিয়েছিলেন, বালখিল্য চাপল্যে নয় প্রয়োজনে, একবিন্দু মৌলিকত্ব বিসর্জন না দিয়ে, ইতিহাস চেতনায় বিঘ্ন না ঘটিয়ে। আর বলতে খারাপ লাগছে আমরা যাঁদের পঞ্চাশের কবি ব'লি তাদের একটা বড় অংশ গীনস্‌বার্গ এবং অন্যান্য বীট-বংশের কবিদের নকল ক'রেছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্কদের মত। 'অপ্রাপ্তবয়স্কদের মত' তারা পরে বুঝেছিলেন ব'লেই ঝাণ্ডা তুলে এখন তাঁরা বলেন, আমাদের ওপর কোনো প্রভাব পড়েনি কোনো কবিরই, আমরা এক নম্বরের মৌলিক ;—আরে প্রভাব প'ড়লে কি মৌলিকতা কমে ? (তাদের এলিয়টের Tradition and individual talent নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি-ও কি পড়া নেই ?)—এমনকি ভয়ানক নাক উঁচু, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী Genius of geniuses গ্যেটে কালিদাসের 'মেঘদূত' এর অনুবাদ পড়ে বদলেছিলেন তাঁর magnum opus 'ফাউস্ট' নাট্যকবিতার ফর্ম, বসিয়েছিলেন কালিদাসের নাট্যকলার পদ্ধতিতে বিখ্যাত prologue। ফর্মের কথা বাদই দিলাম, তিনি-ও তো Mc Pherson চুরি ক'রে নিজের নামে 'ওসিয়ান' নামক যে বই ছাপিয়ে ছিলেন (আসলে যা পুরোনো Scothish ব্যালাডের সংগ্রহ) তা প'ড়ে কম উদ্বুদ্ধ হননি। —প্রবন্ধের বিষয়ের দিকে তাকিয়ে পাঠককে আলোচনার ভিতটা জানানো প্রয়োজন বোধ ক'রেই এই ভূমিকা।

প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক। ৩০-এর দশকে কলকাতার কথা তথা পৃথিবীর। এক জগঝম্প শ্যামবাজারের মোড়ের মাঝখানে তখন আমরা দাঁড়িয়ে, একদিকে বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি, আকাশে বাতাসে বারুদের গন্ধ, মানুষ ভুলেছে প্রকৃতি, মানুষ ভুলেছে নারী প্রেম ; শুধু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাই নয় ধ্বংসের আশঙ্কা দেশে-বিদেশে। "প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অস্ত্র ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা।" দেশে চলেছে তার মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন—একদিকে গান্ধী আমরণ অনশন ক'রছেন, অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রামে যুবকেরা মত্ত। ভেঙে যাচ্ছে সমস্ত পুরোনো সামাজিক মূল্যবোধ, তৈরি হ'চ্ছেনা কোনো বিকল্প—রঙ বলতে কালো, নম্বর একটাই তা শূন্য। ইংরিজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত পর্যন্ত যে সমাজ বৃটিশ আদর্শে বুঁদ হ'য়ে বসেছিলেন এতদিন, তার ভীত এখন ভাঙনের মুখে। ভারতবর্ষের স্নায়ু-কেন্দ্র কলকাতা এখন নৈরাশ্যের কালো হাওয়ায় নিমগ্ন, ছায়া ঘনায়েছে বনে বনে, সবুজ উপত্যকা এখন ফনীমনসার কাঁটাজাল। —তাহ'লে কবি কী লিখবেন ? —আসল কবিতাতো বাস্তবের নামান্তর, কিন্তু কী সেই বাস্তব ? —ইউরোপে যেমন, ভারতে, প্রকৃত অর্থে কলকাতায় মায় বাংলাদেশেও ঠিক একই অবস্থা। রোমান্টিকতা, তোমাকে বিদায় ; কোথায় সেই sentimentality, যার গূঢ় অর্থ হ'চ্ছে ধ'রে নিতে হবে পৃথিবী সর্বমঙ্গলময়, সুন্দর ও ভালো, কিন্তু মাঝে-মাঝে সেখানে চিড় ধরে, তা এত সামান্য যে তাকে নিয়ে দুঃখ বিলাস চলে। কবিতাতো এসব নিয়েই লেখা হ'চ্ছিল মোটা-মুটি।

কিন্তু কে জানত যুদ্ধের বিদ্রোহের আশঙ্কা নীরব ক'রে দেবে প্রেম, থাকবেনা কবিতায় নারী, আকাশে উড়বে শকুন, কোকিলের গান যাবেনা শোনা, এপ্রিল হবে নিষ্ঠুরতম মাস, প্রেমিকার হৃদয়ের মধ্যে ট্যাক্সির অস্থির মিটারের ধুকপুকুনি, কলকাতার রাত্রির চিত্র মানে কুষ্ঠ আক্রান্ত মানুষ হাইড্রেণ্ট থেকে জল চেটে খাচ্ছে। —অতএব কবিতার জন্য চাই অন্য এক ভাষা, কবিতার এখন বিষয়। এই সময়েই এলিয়টের প্রবেশ। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন আমাদের হাতে হাতে তখন এলিয়টের কবিতা, পাউণ্ডের কবিতা, হাক্সলির উপন্যাস। সমসময়েই বিষ্ণু দে অনুবাদ ক'রলেন এলিয়টের 'The hollow man', আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ ক'রলেন 'The journey of the Magi'। আধুনিক কবিদের মধ্যে এলিয়ট ও পাউণ্ড ধর্মী কবিতা লেখার শুরু হোলো।

আসলে এই সঙ্কট-মুহূর্তে ৩০-এর দশকের কবিরা এলিয়টের কবিতায় এক নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'লেন। প্রবল ধী-শক্তি সম্পন্ন এই কবির মধ্যে রয়েছে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সাহস—তিনি বর্তমান পৃথিবীর মাঝখানে দাড়িয়ে যেন বললেন, ঐতিহ্যকে যেমন অস্বীকার করা যায়না, ঠিক তেমনই আবার ইতিহাসকে থামিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাঁর কবিতায় বাঙালি কবিরা পেলেন সেই পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা যা ক্ষয়িষ্ণু নির্বেদের ছবি পরিষ্কার ক'রে মেলে ধরে, মেলে ধরে দিক-নির্দেশহীন আধুনিক মনস্কতা, ভাঙন। যুদ্ধপূর্ব ইউরোপের একটি চিত্র, যার সঙ্গে বাঙালি কবিরা একাত্ম হলেন। কিন্তু একটি ইংরেজের কাছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যতটা তাৎক্ষণিক বাস্তব, আমাদের কাছে কি সেটা একই রকম? অবশ্যই নয়, একাত্মতাটা এসেছিল অন্য দিক থেকে। কলকাতার মত এই বিশাল মেট্রোপলিসের তোলপাড অবস্থায় যে অনিশ্চিত নৈরাজ্য, নির্বেদ এবং ভীড়ে কবি যখন একা, তখন এলিয়ট বলেন —''আমরা সব ফাঁপা মানুষ। আমরা সব ধ্বসা মানুষ। ঠেস দিয়ে চলেছি এ ওর গায়ে। মাথার খুলি খড়ে ঠুসে! হায়রে! ...'' (অনুবাদ: বিষ্ণু দে) তখন একাত্মিকরণ আশ্চর্য নয়।

এতক্ষণ আমরা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে তিরিশের বাংলা কবিতার থীম নিয়ে আলোচনা ক'রেছি। কিন্তু কবিতা ভাষায় লেখা হয়, ভাষাই বিষয়ের বাহন; ভাষার নিজস্ব লজিক আছে, কবিতার ভাষা লজিককে নিয়ে লজিকের ওপরে চলে যায়, যোগ হয় ভঙ্গি, দ্যোতনা, ঝঙ্কার—ছবি, চিত্রকল্প, ambignity এবং সর্বোপরি ভাব। বাংলা ভাষা মূলত সুরের ভাষা, ছন্দের ভাষা। বাংলা ভাষা tone নির্ভর, তাই ফরাসী ভাষা—সমস্ত romance ভাষা গুলিতেই tone-এর একটা মস্ত ভূমিকা রয়েছে-তাই ব'লে এ কথা বলছিনা Romance ভাষা গুলিকে tonal language-এর আওতায় ফেলছি। এখন সমস্যা, এই বাহন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বারুদের গন্ধভরা আকাশ ঘোলা কালো বৃষ্টি, যুদ্ধে দমফাটানো আওয়াজ, অন্যদিকে দেশে রক্তক্ষয়ী

সন্ত্রাসবাদিদের আন্দোলন; আর গান্ধী। বাহন আমাদের একটাই, তা সোজাসুজি রবীন্দ্রনাথের ভাষা। —কবিরা একটু থেমে, যখন "দূর দেশের ওই রাখাল ছেলে"-কে কলকাতার অবস্থার সঙ্গে মেলাতে পারছেননা—তাহলে গদ্য কবিতায় যাওয়া যাক, এমন এক ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমন এক বটবৃক্ষ যার ঝুরি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়—অত্যন্ত ক্ষুরধার মারাত্মক এই প্রতিভাধর গদ্য-কবিতা, যার প্রকৃত উদাহরণ 'পুনশ্চ' ও 'পরিশেষ'। ঋণ ব'লেতো একটা কথা আছে, লাল ঝাণ্ডারা তা আর মানুন না মানুন। এক দোলাচলের সৃষ্টি হোলো। ধ্রুব তারাই যখন কক্ষ পরিবর্তন করছেন তখন গ্রহ-উপগ্রহ কোথায় যাবে? যার স্থির অচঞ্চল মূর্তিকে ধ'রে নিয়ে যে বিপ্লবী নাচ, তিনি আত্মমগ্ন হয়ে যদি এক অচঞ্চলতার থেকে আরেক অচঞ্চল মুক্তিতে ব্যাপ্ত হন তাহ'লে কোথায় যাব? —এদিকে বাঙালি কবিদের মধ্যে দেখা গেল আরেক চেতনা। রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে না এসে উপায় নেই। যাঁর ভাষা ছন্দ, আনন্দ, মায় যাঁর হাতের লেখা পর্যন্ত আমাদের আঙুলে, যাঁর জীবন একটি epoch এ পরিণত হ'য়েছে, তাঁকে ফেলে বারুদের আস্তানার মধ্যে কোনো এক এলিয়ট—সাদা চামড়ার এক সাহেবের দ্বারস্থ হব? —তৎসময়ের কবিদের কাছ থেকে আধা কাল্পনিক এই সংকট আমি খুবই উপলব্ধি ক'রতে পারি। অথচ বুঝতে পারি 'কোপাই'-এর গদ্যের ফর্ম দিয়ে এ-মনস্কতা যা পীড়িত কলকাতাকে আক্রান্ত ক'রে চ'লেছে তা প্রকাশ অসম্ভব। আমি জানি অতি রবীন্দ্রভক্ত এক্ষুণি ব'লবেন 'বাঁশি' কবিতাটির কথা। আমি বলতে দ্বিধা করবনা, যতই আমি রবীন্দ্রভক্ত হ'ইনাকোন যে, এ কবিতাটি বড় 'বানানো' 'আমিও পারি' 'আমিও পারি' ভাব আছে। সোজা কথা verlaine-এর মতানুসারে কেটে-কেটে কথা বল, ভাষাকে ছেঁটে কথার ভাষায় কথা বল, উপমার দরকার নেই। ঘাড় মটকে দাও 'আপাত' ছন্দের। তরুণ সময় সেন এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু মজা এই রবীন্দ্রনাথ না বিষ্ণু দে, না সময় সেন, না এলিয়ট কাউকেই বর্জন করেননি।

আর অন্যদিকে মহাযুদ্ধের ক্লেদ থেকে এলিয়টও মুক্তি চাইছেন, তিনিতো ভাবছেননা "ইহাই শেষ", যুবক পাউণ্ডতো বসন্তের হাওয়া দেখলেন 'দ্যা লা মেত্রোয়'। পল এলুয়ারের মত কবি বলছেন প্রেমের কবিতা লেখা হ'চ্ছেনা কেন? একজন পুরোপুরি মার্ক্সিস্ট হ'য়ে ঘোষনা করলেন প্রেমের মুক্তি চাই।

রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়ট

জগন্নাথ চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়ট এ দু জন এতই আলাদা যে এদের একসঙ্গে বিচার করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী, এলিয়ট প্রবাসী। স্বদেশী কবির দায়দায়িত্ব অনেক, তার পক্ষে অর্জনে ক্লেশ নেই কিন্তু বর্জনে বহু বাধা। পক্ষান্তরে, প্রবাসই যার স্বদেশ তার পক্ষে বর্জন শুধু সহজ নয় স্বাভাবিক, কিন্তু অর্জন সহজসাধ্য নয়। ঐতিহ্য এবং ব্যক্তিগত প্রতিভা (এলিয়টের Tradition and the Individual Talent প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) এ-দুয়ের দ্বন্দ্ব তাই দু'জন কবি দুই-ভাবে ভোগ করেন। রবীন্দ্রনাথকে উনিশ ও বিশ শতকের ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবাই যায় না, তাঁর কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ-কেও না। কিন্তু এলিয়টকে আমেরিকা বা ইংলণ্ডের কবি বলে চিহ্নিত করা আবশ্যিক তো নয়ই, বরং তা বিড়ম্বনামাত্র। একটি প্রাচীন মন্দির বা প্রাসাদের চত্বরে জ্যাজবাণ্ডের আয়োজন করা আর যাই হোক অনায়াস বা সুলভ হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী চত্বরকে কখনই বর্জন করতে সফল হননি। ফলে তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনে ঐতিহ্যের পক্ষে তিনি যতো ওকালতি করেছেন তা ঐতিহ্য-উত্তরণের প্রচ্ছন্ন কামনা ও প্রচেষ্টামাত্র। দেশত্যাগী এলিয়ট অর্জিত স্বদেশের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের নামে এমন সব কাণ্ড করেছেন যা ভাবতে গেলে এই বিখ্যাত কবির জন্য লজ্জায় অধোবদন হতে ইচ্ছে করে। ইংলণ্ডে এসে মার্কিনী এলিয়ট যখন গলা বাড়িয়ে নিজেকে মস্ত রাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা করেন তখন এমন কে আছে যে না হাসি চেপে থাকতে পারে? মার্কিনী গণতন্ত্রী ঐতিহ্যকে বর্জনের মধ্যে আসলে তাঁর নব্য ঐতিহ্যসন্ধানের প্রয়াসই লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য এই প্রয়াসে তিনি একেবারেই সফল হননি। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্য বর্জন করতে পারেন নি, এলিয়ট ঐতিহ্য অর্জন করতে পারেননি। ঐতিহ্য দু'জনকেই ভুগিয়েছে।

রবীন্দ্রাথের জগতে ঐতিহ্য বড্ড বেশি জায়গা দখল করে আছে, আর এলিয়টের জগতে তার বড্ড অভাব। আর এই অভাবটাই তাঁর কাব্যের স্বকীয়তা বা স্বভাব হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বা এলিয়ট দুজনেই প্রতিভাবান কবি। প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠা করতে একজনকে দুরূহ পরিশ্রম করতে হয়েছে, আরেকজন প্রায় অনায়াসেই তা সম্পন্ন করেছেন। কাব্যের কারিগরি দিক একটা আছে, সেখানে অবশ্য পরিশ্রম দুজনকেই করতে হয়েছে; এখানে আমি সে-শ্রমের কথা বলছি না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এলিয়টকে জানা ও বোঝার প্রয়োজন ছিল, বুঝবার কিছু চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু এলিয়টের পক্ষে

রবীন্দ্রনাথকে জানা বা বোঝার কোনো প্রয়োজন ছিল না। যদি তুলনা করতে হয় তবে রবীন্দ্রনাথ ও য়েটসের মধ্যেই তুলনা সংগত, এদের ঐতিহ্যগত সমস্যা ও আধুনিকতা-অর্জনের সমস্যা কিছুটা তুল্য, উভয়েই উনবিংশ বিংশশতকের এক দীর্ঘ সেতুবন্ধ। কিন্তু এলিয়টের? প্রথম মহাযুদ্ধের গোলাবর্ষণের আগে তিনি যেন এক নিশ্চিহ্ন পুরুষ। তিনি একবারেই এবং একেবারেই আধুনিক। এক দশক ধরে উনবিংশ শতক বিগত হয়েও বিগত হচ্ছিল না, এডোয়ার্ডী বা জর্জীয় নামের আড়ালে টিঁকে থাকছিল। এমন সময় বিশ্বযুদ্ধ বাধলো। এবং মহাযুদ্ধের কামানে যেটি নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হল সেটি উনিশ শতক এবং উনিশ-শতকী ঐতিহ্য। এই নূতন আসরে প্রাচীন মহারথীদের পদচালনা কঠিন হল। যারা অসাধারণ প্রতিভাবান নন তাঁরা শুধু প্রাণেই বেঁচে রইলেন। কিন্তু য়েটস পরিবর্তন ঘটালেন নিজের কাব্যদেহে, রবীন্দ্রনাথও ব্যাপৃত হলেন এই কায়কল্প সাধনায়। এলিয়ট এত সহজেই নবীন যে এই ধরনের সাধনা তাঁর কাছে নিরর্থক, তখনই তাঁর দৃষ্টি ঐতিহ্যহীনতা থেকে ঐহিহ্যের দিকে। তিনি লিখলেন: 'যেটি দাবী করতে হবে তা হচ্ছে এই যে কবিকে অবশ্যই অতীত সম্পর্কে চেতনা বৃদ্ধি বা অর্জন করতে হবে এবং এই চেতনা তাকে সমগ্র কর্ম-জীবন ভরই বাড়িয়ে যেতে হবে, (What is to be insisted upon is that the poet must develop or procure the consciousness of the past and that he should continue to develop this conci ousness throughout this career—Tradition and he Individual Talent)। এই পশ্চাৎদৃষ্টির পরিণতি আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; বোঝাতে চাইছি যে এলিয়ট এতটাই ঐতিহ্যভারমুক্ত যে ঐতিহ্যের জন্যই তিনি যেন এখানে বেশ খানিকটা উদগ্রীব।

আধুনিকতার রাজ্যে সচেতন যাত্রা রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট। 'শেষের কবিতার অমিট্ রে আধুনিক নায়ক: তার পক্ষে ডান-এর কবিতা আবৃত্তি না করে উপায় নেই। ডান-এর কবিতার স্বাদ তখন নতুন করে আবিষ্কৃত এলিয়টের কাব্য এবং সমালোচনার মাধ্যমেই। এলিয়ট নিজেই একজন নব্য মেটাফিজিকল্। আধুনিক কাব্য শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিকতার মর্মসন্ধানেই ব্যস্ত, এবং সেজন্য তাঁর প্রবন্ধে বেশ বিস্তারিত ভাবেই এলিয়টের কবিতার প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: 'এইজন্যে আজকের দিনে যে সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক-কালের কৌলীণ্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এইরকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্য তা নয়।' (রবীন্দ্র রচনাবলী: জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৪শ খণ্ড' পৃ: ৩৪৬)। রবীন্দ্রনাথ এর পর এলিয়টের Preludes শীর্ষক কবিতাটি অনেকটাই বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং বেশ কিছু অংশ মূল ইংরেজী থেকে

উদ্ধৃতও করেছেন। অনুবাদ যেন তাঁর আধুনিকতায়-হাত পাকানোর চেষ্টা। অনুবাদ-সমস্যা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁদের কাছে এটি খুব মূল্যবান দলিল। কবিতার প্রথম অংশ মূলে এরূপ :

The winter evening settles down
With smell of steaks in passage ways
Six o'clock.
The burnt-out ends of smoky days.
And now a gusty shower wraps
The grimy scraps
Of withered leaves about your feet
The newspapers from vacant lots ;
The showers beat
On broken blinds and chimney pots,
And at the corner of the street
A lonely cab-horse steams and stamps
And then the lighting of the lamps.

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে :

এ ঘরে ও ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্ধ
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ'টা—
ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল।
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুকনো পাতা
আর ছেড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা শার্সি আর চিমনির চোঙের উপর
বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া—
ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর।

তৃতীয় অংশের মূলের আরম্ভ :

You tossed a blanket from the bed
You lay upon your back and waited ;
you dozed, and watched the night revealing
The thousand sordid images
Of which your soul was constituted ;

এই মেয়েটির বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে দাঁড়িয়েছে :

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা,
চীৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো ঝিমচ্ছ, দেখছ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে
হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।

এর পর রবীন্দ্রনাথ কবিতার শেষ অংশ প্রায় পুরোটাই ইংরেজীতে উদ্ধৃত করেছেন এবং শেষের তিনটি পংক্তি:

Wipe your hand across your mounth and laugh ;
The worlds revolve like ancient women
Gathering fuel in vacant lots

অনুবাদ করেছেন এই ভাবে:

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও।
দেখো সংসারটা পাক খাচ্ছে, যেন বুড়িগুলো
ঘুঁটে কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।

এরপর রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন: 'এই ঘুঁটে কুড়োনো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিরুচি স্পষ্টই দেখা যায়। সাবেক কালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙিন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা-ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন, ধোপ দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না করে। কাদার উপর অনুরাগ আছে বলে নয় কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে, মানতে হবে বলেই।' (ঐ, পৃঃ ৩৪৭)। উপরে কয়েকটি জায়গায় 'পোড়ো জমি' কথাটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন সম্ভবত এলিয়টের Waste Land স্মরণে রেখেই। এলিয়টের 'পোড়ো জমি'র জগতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যুগপৎ আকর্ষন ও বিকর্ষণ এখানে প্রকট। আকৃষ্ট বলেই তিনি এলিয়টের কবিতা অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত; আবার তাঁর মন্তব্যের মধ্যে বিরূপতাও গোপন নেই। তিনি গ্রহণ করতে চান কিন্তু পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন না। তার কারণ এলিয়টের কবি-স্বভাব এবং রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাবের মধ্যে মিল ছিল খুব সামান্যই। তাই তিনি 'কবির অনভিরুচি'র উপর অতটা জোর দিয়েছিন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'কিন্তু আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক-বিপ্লব-জনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যে শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করিনি।' (ঐ, পৃঃ ৩৪৮)। এর পর রবীন্দ্রনাথ নামোল্লেখ না

করে এলিয়টের Aunt Helen শীর্ষক কবিতার উপর মন্তব্য করেছেন। মূল কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি:

Miss Helen Slingsby was my maiden aunt,
And lived in a small house near a fashionable square
Cared for by servants to the number of four,
Now when she died there was silence in heaven
And silence at her end of the street.
The shutters were drawn and the undertaker wiped his feet
He was aware that this sort of thing had occurred before.
The dogs were handsomely provided for,
But shortly afterwards the parrot died too.
The Dresden clock continued ticking on the mantle piece,
And the footman sat upon the dining-table
Holding the second housemaid on his knees—
Who had always been so careful while her mistress lived.

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য 'বিষয়টি এই: বুড়ি মারা গেল—সে বড়ো ঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলি গুলো নাবিয়ে-দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমত সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এদিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো খানসামা ডিনার টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে। ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে, তা হলেই কি যথেষ্ট হল। এ কবিতাটা লেখবার গরজ কী নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন।' (ঐ, পৃ ৩৫০)। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ শুধু আলোচনার জের ধরে নয় আলাদা-ভাবেও এলিয়টের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। The Journey of the Magi এর আরম্ভ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো বিরূপ মন্তব্য কিন্তু আমরা পাই না।

'A cold coming we had of it,
Just the worst time of the year
For a journey, and such a long journey.
The ways deep and the weather sharp,
The very dead of winter.'
And the camels galled, sore footed, refractory,
Lying down in the melting snow.
There were times we regretted
The summer palaces on slopes, the terraces,

And the silken girls bringing sherbet.
Then the camel men cursing and grambling
And running away, and wanting their liquor and women,
And the night-fires going out, and thc lack of shelters,
And the cities hostile and the towns unfriendly
And the villages dirty and charging high prices,
A hard time we had of it.

....

কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা,
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সবচেয়ে খারাপ
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জয় শীত।
ঘাড়ে ক্ষত, পায়ে ব্যাথা, মেজাজ চড়া উটগুলো শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে।
মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে
যখন মনে পড়ে পাহাড়তলিতে বসন্তমঞ্জিল, তার চাতাল,
আর শরবতের পেয়ালা হাতে রেশমি সাজে যুবতীর দল।
এদিকে উটওয়ালারা গাল পাড়ে গনগন করে রাগে,
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে।
মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না
নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা, নগরীতে সন্দেহ।
গ্রামগুলো নোংরা, তারা চড়া দাম হাঁকে।
কঠিন মুশকিল।

রবীন্দ্রনাথের দুর্জয় জীবনীশক্তি কাব্যশরীরেও প্রবাহিত ছিল। আধুনিকতার প্রতি তাঁর যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই জীবনীশক্তিরই পরিচায়ক। এলিয়ট একটি প্রবন্ধে টেনিসন ও হুইটম্যান উভয় কবিকেই উনবিংশ শতকের প্রতিভূ বলেছিলেন। যে গুণপনার জন্য এঁরা, এলিয়টের মতে খাঁটি উনিশ শতকী তা হচ্ছে এঁদের রচনায় প্রগতিবাদ, আশাবাদ এবং সর্বোপরি আত্মসন্তুষ্টভাব। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেও এক বিশাল অংশে ধ্বনিত এই সহজ প্রত্যয়—প্রগতিবাদ, আশাবাদ ও আত্মসন্তুষ্টি। বিপ্লবী বা প্রতিক্রিয়াশীল না হয়েও রক্ষণশীল হওয়া যায়, প্রগতিতে বিশ্বাস রেখেও ভাবা চলে যে পুরাতনকে বজায় রাখাই প্রগতি ; প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকী মেজাজের মধ্যে একটি আন্তরিক রক্ষণশীলতাই বিদ্যমান। রবীন্দ্র রচনাবলীর মধ্য দিয়ে বহুক্ষণ বা বহুকাল অতিবাহিত করে কারো যদি মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বড্ড বেশি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, বড্ড বেশি আত্মতৃপ্ত, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথে নির্জনতা অবশ্যই আছে কিন্তু নিঃসংগতা নেই, দুঃখ বা বেদনা

অনেক আছে, কিন্তু যন্ত্রণা নেই। হুইটম্যান ও টেনিসনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল সহজেই চোখে পড়ে কিন্তু উনিশ শতকের ফরাসী কবি বোদলেয়রের সঙ্গে তাঁর মিল একেবারেই পাওয়া যায় না। বোদলেয়র উনিশ শতকে জন্মেও উনিশ শতকী নন; 'বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি'র জন্য তিনি আত্মিক বিচারে এলিয়ট ও 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের'ই সমগোত্রীয়।

এই তুলনায় আমরা এলিয়টের সেই সাহিত্য-রূপ ও চরিত্রকেই প্রাধান্য দিচ্ছি যা ১৯১৯ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত প্রকট। খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে যুক্তি সন্ধানের পূর্ববর্তী এই অধ্যায়েই এলিয়ট ষোড়শ সপ্তদশ শতকের নাট্যকার ও কবিদের সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়েছেন, যার ফলশ্রুতি The Sacred Wood (১৯২০)। পরবর্তী অধ্যায়ে কবি ও সমালোচক এলিয়টের সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তা চলে গেছে মধ্যযুগে এবং আধুনিকতার সঙ্গে ঘটিয়েছে চিরবিচ্ছেদ। Dante (১৯২৯) ও After Strange Gods (১৯৩৪) এর লেখক এক মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রবক্তামাত্র। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ঠিক সেই সময় গভীর আগ্রহে আধুনিকতার পাঠ গ্রহণ করছেন, উনিশ শতকী ঐতিহ্যের গুরুভার লাঘব করতে অনেকাংশে সাফল্যও অর্জন করেছেন। 'আধুনিক কাব্য' প্রসঙ্গে তিনি সহানুভূতির সঙ্গেই লিখেছেন: 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এই জন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেননা অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।' ঐ, পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬)। একই প্রবন্ধে তিনি এলিয়টের গুরু এজরা পাউণ্ডের কবিতার উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে আলোড়ন ও দ্বন্দ্ব, গ্রহণ-বর্জনের যে দুঃসাধ্য চেষ্টা চলছিল তারা ঐ সময়কার আরেকটি প্রবন্ধে বেশ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজের লেখা একটি পুরোনো বহুপরিচিত কবিতা উদ্ধৃত করেছেন:

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নতুন খেলা
রাত্রিবেলা
মরণ দোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা;
প্রাণেতে আমাতে খেলিব দুজনে ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা।

এই 'নূতন খেলা'র যে-অর্থ কবি এই প্রবন্ধে আমাদের উপহার দিয়েছেন তা কিন্তু একেবারেই উনিশ-শতকী। অন্তত এই প্রবন্ধে তিনি তাঁর নিজের কবিতার মধ্যেই একটি 'নূতনের' ব্যাখ্যা খুঁজতে পারতেন, মৃত্যু ও শূন্যতাকে নূতনভাবে গ্রহনের কথা বলতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। তিনি

এখানে উপনিষদ আমদানি করে অমিলকেও, মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন: "আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদয় মনীসা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকেও। তখন কী হয়। মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেননা বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ। এই আধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা চলে। জীবনে শূন্যবোধ আমাদের ব্যথা দেয়, সত্তাবোধের ম্লানতার সংসারে এমন কিছু অভাব ঘটে যাতে আমাদের অনুভূতির সাড়া জাগে না, সেখানে আমদের ব্যক্তিবোধকে জাগ্রত রাখবার মতো এমন কোনো বাণী নেই যা স্পষ্ট ভাষায় বলছে 'আমি আছি'।" (ঐ, পৃ: ৩৫৯)। যে-শূন্যতার বোধ থেকে বোদলেয়র ও এলিয়টের 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড' জাতীয় কাব্য অংকুরিত হয় সেই শূন্যতার বোধে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'অনুভূতির সাড়া জাগে না'। পূর্ণতা এবং শূন্যতা উভয় থেকেই যে উৎকৃষ্ট কাব্য সম্ভব রবীন্দ্রনাথ তা যেন কিছুতেই মানতে চান না। অথচ রবীন্দ্রনাথ এই একই সময়ে নূতনকে, আধুনিককে বুঝবার জন্য চেষ্টাও কম করছেন না। আধুনিক চিত্র সম্বন্ধেও অবহিত হয়েছেন,: বলছেন "সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করেছিল। চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্য সে বিবিধ প্রকারে উৎপতে শুরু করে দিলে। সে বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে।" (ঐ, পৃ: ৩৪৬)। একই সুরে কাব্যসাহিত্যের আলোচনায় তিনি বলছেন: "মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যেটা রঙিন ছিল আজ সেটা ফিকে হয়ে এসেছে, সেই মিঠের আভাসমাত্র নিয়ে ক্ষুধা মেটে না, বস্তু চাই।" (ঐ পৃ: ৩৪৪)। এই যে ঘোষণা —'দেখতে হবে,' এটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের কথা নয়, এটা তাঁর পরিশ্রমের কথা, প্রচেষ্টার কথা; দেখার একটা জরুরিত্ব উপস্থিত এইটুকুই তিনি মানছেন, কিন্তু আন্তরিকভাবে ঐভাবে দেখতে পাচ্ছেন এমন কথা বলছেন না। রবীন্দ্রনাথ যেন উনিশ শতকী দরবেশ, কিন্তু তাঁর আলখাল্লার উপর বিশ শতকের কাল-বোশেখি ভর করতে চাইছে। প্রাচীন মেজাই-এর বকলমে এলিএট আধুনিক মনের আর্তি ও দ্বন্দ্ব ফোটাত চেয়েছিলেন। সেই একই প্রেরণা হয়তো রবীন্দ্রনাথকে নিযুক্ত করেছিল এলিয়টের The Journey of the Magi কবিতার অনুবাদে। মেজাই-এর উক্তি, এলিয়টের উক্তি, এবং রবীন্দ্রনাথের উক্তি এক হয়ে গেছে কবিতার শেষ অংশে:

মনে পড়ে এসব ঘটেছে অনেক কলে আগে,
আবার ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে রাখো,

এই লিখে রাখো, এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।
জন্ম একটা হয়েছিল বটে,
প্রমাণ পেয়েছি সন্দেহ নেই।
এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও,
মনে ভাবতেম তারা এক নয়।
কিন্তু এই যে জন্ম এ বড়ো কঠোর,
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।
এলেম ফিরে আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়।
আর কিন্তু স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধিবিধানে
যার মধ্যে আছে সব অনাত্মীয় আপন দেব-দেবী আঁকড়ে ধরে।
আর একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।

কবিতার কথা ঃ এলিয়ট ও জীবনানন্দ

প্রভাত মিশ্র

১. কবিতার সঙ্গে গানের আদিম গলাগলি সকলেরই জানা আছে। যে কোন দেশেই কবিতার উৎপত্তি হ'য়েছে মুখের গানের প্রকাশমাধ্যমে। এই সেদিন পর্যন্ত সংগীতই কবিতার সব বা অনেক কিছু ভাবা হ'য়েছে। একটা সময় এলো এমন, যখন কবিতায় সংগীতের জায়গা দখল করে নিল ছবি। উনিশ শতকের শুরু থেকে সূচনা এই জায়গাদখলের। আর পরে পরপর দু'দুটো মহাযুদ্ধের অভিঘাত এই দখল পাকা ক'রে দিল। ব্যক্তিজীবনের প্রাতিস্বিক সংকট, নানান বৈপরীত্য, সংশয় ও নৈরাশ্য সংগীতছন্দে প্রকট হ'তে পারে ব'লে মনে হ'লো না আর। কবিতায় এলো ছবি—ছবির পর ছবি। বিশ্ববিবেকের প্রতিমূর্তি পূর্ণতাবাদী আমাদের রবীন্দ্রনাথের হাত তুলে নিল তুলি। সমকালের যে খণ্ডভাব, অপূর্ণতা, বিচ্ছিন্নতা ও বীভৎসতা তিনি কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে পারেননি, তা তিনি মেলে ধরলেন তাঁর একটার পর একটা ছবিতে। যেন সময় আর সংগীতে কিছু বলতে পারছে না, সত্য হ'য়ে উঠতে পারছে না, প্রয়োজন হ'লো ছবির।

২. ছবি, যা কাব্যতত্ত্বের পরিভাষায় চিত্রকল্প বা ইমেজ কবিতার জগতে যে-সময় বিশেষ প্রাধান্য পেলো, সেই সময় আমরা পেলাম ইংরেজী ভাষার এলিঅটকে, আর বাংলার জীবনানন্দকে। বয়সের দিক থেকে দুজনের ব্যবধান বছর দশেকের। এলিঅট বড়ো, জীবনানন্দ ছোট। দুজনেই এই বিশ শতকের ধ্বস্ত কালসীমার প্রথমার্ধের কবি। এমন একটা সময়ের কবি, যখন বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক ঘূর্ণ্যাবর্ত, ঘন ঘন বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, যন্ত্রবিজ্ঞানের অতিদ্রুত প্রগতি, মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামবাদ, কিয়ের্কোগার্দের অস্তিবাদ, ফ্রয়েডের মনোবিকলনতত্ত্ব, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, এই-সব জগৎ-জীবনকে ব্যাখ্যা ও বদলের কথাবার্তায় বিশ্বের শিল্পসাহিত্যজগৎ রীতিমতো সোচ্চার। আর এইসব একদিকে সৃষ্টি করছে ব্যক্তি-অস্তিত্বের সংকট, ব্যক্তি তখন কেবল আর স্বগত ভাবনায় থাকতে পারছেনা, তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নৈর্ব্যক্তিকতার আবর্তে। আর এই নৈর্ব্যক্তিকতা দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে, যে কোন নান্দনিক সৃষ্টিতে। কেবল সংগীতে আত্মমগ্ন হ'য়ে কবিতা থাকতে পারলো না আর। তাকে হ'য়ে উঠতে হ'লো ছবি। কেননা ব্যক্তিকতার সঙ্গে সঙ্গীতের যতোটা সম্বন্ধ, ঠিক ততোটা সম্বন্ধ নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে ছবির।

৩. এ-কারণে যতোটা সম্ভব কবিতা থেকে ব্যক্তিকবি দূরে যেতে

থাকলেন। ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভায় এলিঅটই ঘোষনা করে দিলেন কবিতা কোন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে না, প্রকাশ করে একটা মাধ্যম। আর এই মাধ্যমে অর্জিত ধারণা ও অভিজ্ঞতা এক বিশিষ্ট ও অদ্ভুত উপায়ে মিশ্রিত থাকে। কবিতা ব্যক্তি-ভাবাবেগের বন্ধন থেকে মুক্তি। অস্থির সময়ের পরস্থিতিতে মানবিকতাবাদে সচেতন এলিঅট অনেকটা জোর করেই যেন এই ঘোষণা করলেন। দৃষ্ট জগৎ থেকে অর্জিত ধারণা বা প্রতিরূপ এবং অভিজ্ঞতার আশ্চর্য প্রতিমাই কবিতার চিত্রকল্প, বলা বাহুল্য। এলিঅটের মতে এই অভিজ্ঞতার, এই প্রতিরূপের জনক কেবল বিশেষ মুহূর্ত নয়। এই অভিজ্ঞতার নাড়ির যোগ কবির বাল্যকাল থেকে শুরু ক'রে সারা জীবনের ইন্দ্রির-অভিজ্ঞতার। যেহেতু এলিঅটের কাছে কবিতার জরুরি উপাদান চিত্রকল্প. সেহেতু তাঁর কাছে কবিজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট মূল্যবান। জীবনানন্দের কবিতায়ও চিত্রকল্পের প্রাধান্য। জীবনানন্দও তাঁর কবিতার কথা বলতে গিয়ে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ব'লে মেনেছেন। তিনি বলছেন 'কেউ কেউ কবি; কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা র'য়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধ'রে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।' প্রকৃত প্রস্তাবে মুহূর্তের অর্জিত অভিজ্ঞতা অন্তর্জগতে আশ্রিত হ'য়ে স্বতঃই জাগিয়ে দেয় কবির কল্পনাকে, যা জীবনানন্দের কাছে কল্পনাপ্রতিভা বা ভাবপ্রতিভা—যা কবিমানুষের ভিতর জগতে থাকে স্বতন্ত্রভাবে, ঐতিহ্য ও বর্তমান ছুঁয়ে। অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতা কবিতা এবং তার চিত্রকল্পের জন্য দরকারি, তার মূলে র'য়েছে কবির ঐতিহ্যবোধ ও স্বকালচেতনা।

এলিঅটও বারবার কবিতার জনক অভিজ্ঞতার জন্য এই ঐতিহ্যবোধ ও সমকাল চেতনার কথা বলেছেন। ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভাতেই তিনি বলছেন, কোন কবি, কোন শিল্পী কবি বা শিল্পী হিশেবে একাকী বা নির্জনতম হ'য়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ নন। তাঁর ভূমিকা ও মূল্যের নিরূপণে মৃত কবিশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা দেখা জরুরি। সংস্কৃতির সংজ্ঞানির্দেশ-সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়েও তাঁকে এমন মন্তব্যে আসতে হ'য়েছে যে, কবিতায় কখনো এমন কিছু মৌলিকতার সন্ধান পাওয়া যাবে না, যা অতীত থেকে একান্তভাবে স্বতন্ত্র।

৪. জীবনানন্দের কথায়, 'সময় ও পৃথিবী অভিজ্ঞতার আধার। কবিও সঞ্চয়ী।' এই কবিসঞ্চয়ীর অভিজ্ঞতা সার্বিক হ'য়ে ওঠে কবির সচেতনতায়। এবং এখানে কবির দায়িত্ব আছে। তিনি যদি তাঁর সময়, তাঁর পৃথিবীকে চিনতে পারেন, তবেই তিনি এভাবে সচেতন। অর্থাৎ কেবল ঐতিহ্যচেতনা নয়, সমকালচেতনাও কবির অন্তর্জগতে থাকা চাই,কবিতাসৃষ্টির জন্য। তাই কবিতায়, 'ইতিহাসবেদের দরকার এবং সমাজবেদের।' বাস্তবিক, ঐতিহ্যও বর্তমানকাল

বিশেষ দৃষ্টির মধ্যস্থতায় যে চেতনার সৃষ্টি ঘটায় কবির অন্তর্জগতে, সেই চেতনা পুরনো ও চলতি মনুষ্যসমাজ ও মনুষ্যকৃতি ছুঁয়ে থাকে আবশ্যিকভাবে। সেই চেতনাই সৃষ্টি ঘটায় কবিতার। কেন যে বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দকে নির্জনতম কবি বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর কবিতার কথাটুকু পড়লেই তো অন্যরকম মনে হয়, তারপর মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলা পড়লে, এমন কি ধূসর পাণ্ডুলিপি যেটি প'ড়ে বুদ্ধদেব এমন মন্তব্য করেছিলেন, তাতেও এমন কিছু কবিতা আছে যা পড়লে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক কবিমানসিকতার পরিচয় ধরা পড়ে যায়। অবশ্য খুব সম্প্রতি কোন কোন কাব্য সমালোচক দেখানোর চেষ্টা করছেন যে জীবনানন্দ নির্জনতম কবি ছিলেন না।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যে ইতিহাসচেতনার কথা জীবনানন্দের কবিতার কথায়, তা এলিঅটের কবিতাবিষয় কিছু কথায়ও আছে। ঐতিহ্য ও ব্যক্তি প্রতিভাতেই তিনি জানাচ্ছেন, কবিলেখকের অন্তর্জগতে থাথা ইতিহাসচেতনাই তাঁকে কেবল তাঁর মজ্জাগত প্রজন্মের বৃত্তে আবদ্ধ রাখে না, হোমার থেকে শুরু ক'রে অতীতের সব কবি ও তাঁদের সাহিত্যকর্মের দিকে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে দেয়। ঐতিহ্য ও বর্তমানের এক আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটে যায় কবিপ্রতিভায়। এলিঅট বলছেন, এই ইতিহাসচেতনা কালসীমাহীনতা, ও সমকালীনত, এ দু'য়েরই চেতনা—এমন কি এদের মিলিত চেতনা। এই ইতিহাস চেতনাই কোন কবিকে ঐতিহ্যমুখী ক'রে তোলে। আর এই চেতনাই, একই সঙ্গে, তাঁকে ক'রে তোলো সমকালচেতন। সমকালীনতা কবিতায় থাকবেই—এলিঅট তাঁর নিজের কবিতায়ই যথেষ্ট ও যথাযথভাবে দেখিয়েছেন। বহুলপঠিত পোড়ো জমি বা ফাঁপা মানুষের কথা মনে পড়ালেই চলে এখানে। এই সমকালীনতা ঐতিহ্য থেকে, ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়—একথা যেমন এলিঅট স্বীকার করেন, তেমন করেন জীবনানন্দ। দুজনেই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কবিতা কালীন হ'য়েও কালাতিশায়ী। কারণ জীবনানন্দের ভাষায়, কবিতায় আছে 'চিরপদার্থ।'

৫. কবিতার এই চিরপদার্থের কথা এলিঅটও বলেছেন। জীবনানন্দ মনে করতেন, এই চিরপদার্থের আধারে 'লোকসেবা', 'সমাজধ্যান' বা 'সরসতা' স্পষ্ট হ'তে পারে যুগসচেতন কবির কবিতায়। কিন্তু চিরপদার্থ থাকতেই হবে। কিপলিং-এর কবিতার নির্বাচিত সংগ্রহ সম্পাদনা করতে গিয়ে ভূমিকায় এলিয়ট বলছেন, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ সরাসরি এবং শীঘ্রই কবিতাকে আকর্ষক করে তোলে, কিন্তু এ-জাতীয় সেই কবিতাই প্রকৃতপক্ষে আকর্ষন করে, যাতে কেবল তাৎক্ষণিক বাণী নেই—যা আগামী কালও পড়া যেতে পারে এমন। বলার কথা এই যে কবিতায় রাজনীতি আসতে পারে, কিন্তু রাজনীতির মধ্যে স্বাভাবিক তাৎক্ষণিকতা আছে, তা

কবিতায় থাকলে চলবে না। রাজনৈতিক প্রসঙ্গের কবিতায় যদি চিরন্তন বাণী থাকে, তাহ'লেই তা কবিতা হবে। এলিঅট বলছেন, নিজের কালের স্পর্শ না নিয়েও কবি এমন কিছু বলতে পারেন যা তাঁর সেই সময়কে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আবার কেবল সমকাল নিয়ে যে কবি ব্যস্ত তাঁর রচনায়, তাঁকেও অপাংক্তেয় বলা যায় না কোনভাবে। আসল এবং ফলকথা হ'লো, কবিতা সমকালের বাকপ্রতিমা হ'য়েও বহন করবে শাশ্বত কালের বাণী।

৬. তাহ'লে কি কবিতা দর্শন? রিপাবলিকের দশসংখ্যক অংশে প্লেটো আমাদের জানিয়ে গেছেন, দর্শন ও কবিতার মধ্যে বিবাদটি বেশ প্রাচীন। বিষয়টি নিয়ে এলিঅট তাঁর ভাবনা রেখেছেন শেকসপীয়র ও সেনেকার স্টোয়িসিজম প্রবন্ধে। অনেক পাঠক কবিতাকে দর্শনের আলোয় দেখতে ভালোবাসেন। শেকসপীয়রের কাব্যে কেউ স্টোয়িক দর্শন দেখেন, কেউ তাঁরই কাব্যে দেখেন সিনিসিজম। দান্তের কবিতা তো সেন্ট টমাসের টমিস্টিক দর্শনের প্রকাশমাধ্যম ব'লে মেনে নেওয়া হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাসমূহ উপনিষদের দর্শনপুষ্ট, একথা বলা হয়। এলিঅট বলতে চান যে দর্শন, যা জগৎ-জীবনসম্বন্ধে সুসম্বন্ধ সর্বজনীন মনন ছাড়া কিছু না, কবিতা হ'য়ে উঠতে পারে না। কবির কাছে মননের প্রয়োজনীয়তা আছে। ভাবাবেগকে শূন্য করে কবিতা গড়ে তোলার জন্য মনন প্রয়োজনীয়। কিন্তু শূন্য হ'য়ে যাওয়া মননসংহত ভাবাবেগকে বিশুদ্ধ চিন্তা, দৃষ্টি বা দর্শন মনে করাটা ঠিক না। কবি রূপ দেন তাঁর সময়ের। সেই সময়ে সমাজে যে দর্শন বা ধর্মচিন্তা বিধৃত, তা কবির অভিজ্ঞতায় উঠে আসে। কবিতায় দর্শন প্রচার হয়, এ-কথা ভাবা ঠিক না। কবিতায় ঘোষিত হয় সময়। এলিঅট বলছেন, কবিতা দর্শন, ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মনীতির পরিবর্ত নয়। কবিতার নিজের কাজ আছে। তবে কবিতার এই কাজ বৌদ্ধিক নয়, ভাবাবেগমূলক। তাই বৌদ্ধিক পরিভাষায় কবিতার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তবে পাঠককে কবিতা দেয় সান্ত্বনা—এক বিস্ময়কর সান্ত্বনা। হয়তো এই বিস্ময়কর সান্ত্বনা পেয়েই পাঠক কবিতায় খুঁজে নেন দর্শন। প্রকৃত প্রস্তাবে কবিতায় কোন প্রচলিত বা অচলিত দর্শন থাকে না। যা থাকে বলে মনে হয়, তা সময়বাহিত জীবন সম্বন্ধে কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী।

জীবনানন্দও কবিতাকে কোন দর্শনের পরিবর্ত হিশেবে ভাবতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের 'কবিতার জীবনদর্শন রবীন্দ্রকাব্যের জীবন দেবতাবোধের চেয়ে অন্য জিনিষ।' এখানেই তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের কবি হিশেবে সিদ্ধি। আসল কথা হ'লো, তাঁর নিজস্ব জীবনদৃষ্টি—জীবন অভিজ্ঞতামূলক দর্শন। তাঁর এই জীবনদৃষ্টিই এসেছে তাঁর কবিতায়, এতে যদি কেউ আধ্যাত্মিকতা খুঁজে পান, তা মেনে নিতেও আপত্তি নেই জীবনানন্দের। আধ্যাত্মিকতা কেবল দর্শন বা দার্শনিক বিষয় নয়, তা ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষের নৈর্ব্যক্তিক

জীবনদৃষ্টিও হ'তে পারে। ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের হাওয়ায় বেড়ে উঠেছিলেন, ব্রাহ্মপরিবার ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক জীবনদৃষ্টি তাঁর কবিতায়, তা নিঃসন্দেহে তাঁরই নিজস্ব জীবন দৃষ্টি। কবি হিশেবেই তাঁর এই জীবনদৃষ্টি। উপনিষদের হাওয়ার সঙ্গে তাঁর কবিতাসৃষ্টির মৌলিক সম্বন্ধ না দেখাই ভালো। কবিতাকে দর্শন থেকে স্বতন্ত্র হিশেবে দেখাতে গিয়ে এলিঅট একই কথা বলেছেন দান্তে-প্রসঙ্গে। শেকসপীয়র ও সেনেকার স্টোয়িসিজম প্রবন্ধেই তিনি বলছেন, শেকসপীয়র আর দান্তের মধ্যে পার্থক্য এখানে যে, দান্তে তাঁর সময়ের এক সুসম্বদ্ধ দার্শনিক চিন্তার পৃষ্ঠপোষণা পেয়েছিলেন, শেকসপীয়র তা পান নি। দান্তের পক্ষে তা সৌভাগ্যপ্রাপ্তির মতোন, কিন্তু কবিতাসৃষ্টির ব্যাপারে এই সৌভাগ্য লাভ একটা অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা।

এলিঅট মনে করতেন কোন কবিতায় কোন দর্শনচিন্তা থাকতে পারে, কিন্তু সেই কবিতাকে আগে অবশ্যই কবিতা হ'তে হবে। আর যদি কোন কবিতা কবিতা হ'য়ে ওঠে, তবে তাতে কোন দর্শনচিন্তা না থাকলেও, তা বিশেষ মূল্যবান: দার্শনিকতাই প্রকৃত কবিতার প্রধান বিষয় নয়, প্রধান বিষয় স্থায়ী মানবিক আবেদন, যে আবেদন প্রকাশিত হবে যথাযথ এবং যথার্থ বাকনির্মিতিতে, ভাষায়। বলা বেশী. এই স্থায়ী মানবিক আবেদনই জীবনানন্দের কথার 'চিরপদার্থ'।

৭. দর্শনে ভাবাবেগ বা ইমোশনের ভূমিকাই নেই, সব ভূমিকা বুদ্ধি বা মননের। কবিতায় কিন্তু ভাবাবেগের একটা বড়ো ভূমিকা র'য়েছে। দর্শনের সঙ্গে কবিতার মূলগত বিরোধ এখানেই। তবে এলিঅট কখনোই মনে করতেন না কবিতায় বুদ্ধি বা মননের ভূমিকা আদৌ নেই। কেননা তাঁর বিশিষ্ট মন্তব্য এই যে 'Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion ; it is not the expression of personality, but an escape from personality' ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভা প্রবন্ধে তাঁর যে এই মন্তব্য, এর থেকে স্পষ্ট হয় যে কবিতা হবে নৈর্ব্যক্তিক। নৈর্ব্যক্তিকতা বা অবজেকটিভিটি যদি কবিতার উপজীব্য হয়, তবে যুক্তি, বুদ্ধি, মননের ভূমিকাটা সেখানে হেলাফেলার বিষয় নয় মোটেই। বস্তুত, ফরাসী কাব্য-সমালোচক রেমী দ্য গ্যোরমন্তের একটি কথা, 'আরিগের এন লোইস' (eriger en lois)-এর ওপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এলিঅটের। কথাটির অর্থ হ'লো কিছু সৃষ্টি করতে শুরু করা। কবিতারচনার জন্য কিছু সৃষ্টি করতে শুরু করতে হয়; এর জন্য দরকার হয় মননের দ্বারা বিশ্লেষণ ও সংযোজন। এই বিশ্লেষণ ও সংযোজন হ'লো একপ্রকার সামান্যীকরণশক্তি। মননশক্তি ছাড়া সামান্যী-করণশক্তি অস্তিত্বহীন, অর্থহীন। ভাবাবেগ ব্যক্তিগত বা সাবজেকটিভ, ভাবাবেগ যে ধারণা বা প্রতিরূপ জাগিয়ে দেয় তার সত্তাও ব্যক্তিকতানির্ভর, কিন্তু যখনই এই প্রতিরূপ থেকে কবিতা রচনা হয়, তখন কিছু সৃষ্টি করতে

শুরু করা হয়, তখনই কবিতার চরিত্রে এসে যায় নৈর্ব্যক্তিকতা বা অবজেকটিভিটি। এই নৈর্ব্যক্তিকতাই, এলিঅটের মতে, কবিতার প্রধান চরিত্রলক্ষণ। এই নৈর্ব্যক্তিকতা মনন ছাড়া আসতে পারে না। এই নৈর্ব্যক্তিকতা বা বস্তুনিষ্ঠার কথা কি বলেন নি জীবনানন্দ? যখন তিনি বলেন, কবিতায় থাকবে 'সমস্ত দেশকাল সন্ততির পরিচয়' আর তা-ই তাঁর কথায় 'কালের মহত্তম তাৎপর্য'? এই কালের মহত্তম তাৎপর্য রূপায়ণ করতে গিয়ে কোন বিশেষ দর্শনপ্রস্থানের দ্বারস্থ হ'তে হবে, পৃষ্ঠপোষণা পেতে হবে—এমন জীবনানন্দ মনে করেন নি, এলিঅটও না। প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে শেকসপীয়র ও সেনেকার স্টোয়িসিজম প্রবন্ধে এলিঅট যা বলেছেন স্মরণ করি। এলিঅট বলছেন, শেকসপীয়র যদি কোন ভালো দর্শনচিন্তার অনুগামী হ'য়ে লিখতেন, তাহ'লে হয়তো তিনি বাজে লিখতেন। তিনি লিখছেন 'it was his business to express the greatest emotional intensity of his time, based on whatever his time happened to think.' এলিঅট যাকে বলেন 'greatest emotional intensity of his time', তা-ই জীবনানন্দের কথায় 'কালের মহত্তম তাৎপর্য'।

৮. কবিতার বোধগম্যতা বা বাচ্যার্থ নিয়ে কিছু বলতে চেয়েছেন এলিঅট তাঁর কবিতার প্রয়োজন ও বিচারের প্রয়োজন প্রবন্ধে। কবিতা মাত্রেরই বাচ্যার্থ থাকবে, এমন না হ'লেও যে কোন কবিতারই বাচ্যার্থ—বক্তব্য বিষয় থাকতে পারে। তা থাকা দোষের নয়। বক্তব্য থাকে শুধু গদ্যের, এমন কেউ কেউ মনে করেন। এমন মনে করা ঠিক না। শিল্পের জন্য শিল্প মতটি, এলিঅট মনে করেন, বেশী মাত্রায় ভুল বোঝা হ'য়েছে, প্রয়োগের বেশী হ'য়েছে এর প্রচার। আর এই মতটিই কবিতাকে গদ্য থেকে দূরে রাখতে চায়। যেন কবিতা গদ্যের মতো বাচ্যার্থবহ হবে না, দীর্ঘ হবে না। এলিঅটের বিশ্বাস, কবিতা বাচ্যার্থবহ হতেই পারে। বলা ভালো, হবে। এবং হ'তে পারে দীর্ঘ। আগের আগের অনেক কবি দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা লিখে গেছেন। সেগুলো কেবল স্থূল নয়, সেগুলির গ্রহণযোগ্য সূক্ষ্ম অর্থ আছে—এমন কি যে অর্থ সেগুলির প্রণেতা ধরতে পারেন নি, সেই গভীর বাচ্যার্থও নিহিত আছে। এই খণ্ডকবিতার দিনে, বাচ্যার্থবহ দীর্ঘ কবিতাকে কেবল অতীতের প্রাচীনদের কাজ ব'লে মনে করলে চলবে না। এ-কথা মনে করাও ঠিক না যে, কবিতা কখনো গদ্যমুখী হবে না বরং কবিতা ও গদ্যের পারস্পরিক যোগাযোগে সাহিত্য—কবিতা ও গদ্য, দুইই প্রাণপ্রাচুর্য পাবে। এই পর্যন্ত ভেবে থেমেছেন এলিঅট। জীবনানন্দও আরো এগিয়ে গেছেন। বলেছেন, খণ্ডকবিতায় কবিতার ভবিষ্যৎ নেই। দীর্ঘকবিতা ও শ্লেষবাহী নাট্যরসের 'মহাকবিতা'ই রচিত হবে ভবিষ্যতে। অর্থবহ মহাকবিতার আশা ছিল জীবনানন্দের। শিল্পের জন্য শিল্প মতকে চূড়ান্ত ও একান্ত মনে করেন

নি তিনি। তাঁর কাছেও অর্থবহ দীর্ঘ কবিতা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ কবিতায় যে বাচ্যার্থসুলভ গদ্যময়তা থাকবে, বলা বাহুল্য।

৯. কবিতার বোধগম্যতার কথা ধ'রে কথা এলো। এ-ব্যাপারে জীবনানন্দ বলছেন 'কবিতা সকলের জন্যে নয়, এবং যে পর্যন্ত জনসাধারণের হৃদয় নতুন দিগবলয় অধিকার না করবে সে পর্যন্ত কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর 'কবি'র স্থূল উদ্বোধন ছাড়া বাজারে ও বন্দরে—এবং মানবসমাজ ও সভ্যতার সমগ্রতার ভিতর কোনো প্রথম শ্রেণীর কাব্যের প্রবেশের পথ থাকবে না।' মহৎ কবিতার পাঠের জন্য এক বিশেষ শ্রেণীর পাঠক দরকার, দরকার পাঠকের পক্ষে বিশেষ মানস ক্ষমতা অর্জনের। এক খ্রীষ্টীয় সমাজের ধারণা প্রবন্ধে এলিঅটও আমাদের জানিয়েছেন, গভীর তাৎপর্য বহনকারী সাহিত্যের পাঠক সীমিত, আর জনপ্রিয় লেখকগণ আশিক্ষিত বিচারবুদ্ধিবিহীন মানুষজনের জন্যই লিখে থাকেন।

১০. কবিতা ভাবনায় এলিঅট ও জীবনানন্দ মানবতন্ত্রী। জীবনানন্দের মতো এলিঅট বিশ্বাস করেছেন যে কবিতাকে কালের মহত্তম তাৎপর্যসহ সমস্ত দেশ কাল সন্ততির পরিচয় হ'তে হবে। কিন্তু এলিঅট এমন কথা বলতে পারেন নি 'শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে—মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয়, এমন কি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে—এবং নতুন করে গড়তে চাচ্ছে, এবং এই সৃজনে যেন সমস্ত অসঙ্গতির জট খসিয়ে কোন এক সুসীম আনন্দের দিকে।' জীবনানন্দই বলতে পেরেছেন। আর এখানেই মনে হয়, জীবননানন্দ যতোই মনে করুন না কেন যে প্রাণ ও পরিসরের দিক থেকে বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ হ'তে হ'লে ই'উরোপীয় সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন আলোভূমি নেই, তবু তিনি শেষ পর্যন্ত বহন করেছেন স্বদেশের ঐতিহ্য—তাঁর সাক্ষাৎ অগ্রজ রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকার। এরকম উত্তরাধিকার বহনের সৌভাগ্য এলিঅটের হয় নি। এলিঅট বলতে পারেন নি 'জাগতিক বিষয়ে ক্রমাগত যে আলোর অনুসন্ধান চলেছে সেটা সামাজিক ব্যাপারের অতিরিক্ত সম্পূর্ণ এক শূন্যসন্ধান নয়—সামাজিক স্তরে মানুষের খুব সম্ভব ভবিষ্যৎ র'য়েছে—অনুভব করতে পারা যাবে হয়তো।' জীবনানন্দ বলেছেন। এলিঅট মানবতন্ত্রী হ'য়েও মানবসমাজ-সম্বন্ধে আশাবাদী হ'তে পারেন নি, যেমনটি হ'তে পেরেছিলেন জীবনানন্দ।

একস্তবক এলিয়ট : অনুবাদক সুধীন্দ্রনাথ

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
What might have been is an abstraction
Remaining a Perpetual possibility
Only in a world of speculation.
What might have been and what has been
Point to one end, which is always present.
Foot falls echo in the memory
Down the passage which we did not take
Towards the door we never opened
In to the roze-garden. My words echo
Thus, in your mind.
But to What purpose
Disturbing the dust on a bowl of rose-leaves
I do not know.

(Burnt Norton, PartI, Para-I)

Four Ouartets টি. এস. এলিয়টের সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়টিকে ধরে রেখেছে। চারটি কবিতা একত্রিত হয়েছে। আলাদা ভাবে এই চারটি কবিতা প্রকাশিত হয়—Burnt Norton, East Cooker, The Dry Salvages ও Little Gidding. মূলতঃ সময় ও অনন্ত ধারণাকে সংহত করে আনে এক প্রগাঢ় বোধ : এলিয়টের শৈল্পিক চেতনাও পথ খুঁজে পায় যেন এই কাব্যগুলিতে। শব্দের সম্ভাবনা ও গুরুত্বকেও তিনি সমানভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেন। Four Ouartets-এই নামকরণ থেকেও বোঝা যায় প্রতিটি কবিতায় এক সঙ্গীতধর্মী গাঢ় বুনট তৈরী হয়েছে। যন্ত্রবাদনের উপযোগী যৌথ স্বর চারটি কবিতায় এক সামগ্রিক বোধ এনে দেয়। প্রতিটি কবিতায় মূল প্রতিপন্ন বিষয়—সময়ের অবাস্তবতা যার আনুষঙ্গিকরূপে বর্তমান অতীত স্মৃতিতে মিলে যায় আর ভবিষ্যতকে মনে করায়—তা ফিরে আসে বিশেষ

ঋতু ও স্থানের গভীর তন্ময়তায়। অবশ্য কবিতাগুলিতে কেন্দ্রীয় কোনো চিন্তাভাবনার পর্যায় স্পষ্ট নয়। একটির পর আর একটি কবিতাতে কবি যেন তাঁর সত্যের দিকে ফিরে ফিরে আসেন। তাই ক্রমশঃ এক একটি কবিতা মূল সত্যকে আরো আরও বোধগম্য করে তোলে। এলিয়টের অন্যান্য লেখার থেকে Four Quartets তাঁর নিজস্ব মেজাজ ও পরিবেশ উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে কাব্যময়ভাবে সমাধানের পথ তৈরী করে দেয়।

Burnt Norton লেখার সময় কবির কল্পনা হয়ত চারটি কবিতার এক বৃত্ত গড়ে নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী লেখা হিসেবে স্বভাবতই মানব পরিবেশের আধার আরও বাঙময় হয়ে উঠেছে। এখানে আত্মজীবনীর একটি পর্বকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। Burnt Nnrton আসলে একটি কাছারি। গ্লস্টারশায়ারের কাছে এই জায়গায় হয়ত এলিয়ট থাকতেন। তিনি হয়ত এখানেই তাঁর ধর্মীয় ও আবেগময় সংকটের মধ্যে কটিয়ে ছিলেন তাঁর স্পষ্ট মূহূর্তগুলি। অন্য এক বিচার দেখায় যে কবিতায় আসল জায়গারূপে কখনও সপ্তদশ শতাব্দীর কাছারি ঘুরে আসে নি। যে কোনো জায়গার ইঙ্গিত চিহ্নিত হতেও পারে। কতটা স্মৃতি বা কল্পনা মিশে গেছে তারও তথ্যভিত্তিক আলোচনার সুযোগ নেই। মনে হয় এই কবিতায় আমাদের প্রত্যেকের নিতান্ত ব্যক্তিগত জগত মিশে রয়েছে। তাই চেতনায় ঘটনীয় অনেক কিছুর সঙ্গে অতীত ঘটনা এক হয়। অজানা মানুষের সত্যিকারের জীবন অধ্যায়ের থেকে বেশী করে আমরা সেই স্থানে ঘোরাফেরা করার সুযোগ পেয়ে যাই। অবশ্য কবিতাটিতে দেবতার ধারণা এক মিষ্টিক অনুভূতির আড়ালে ভাসিয়ে নেয় অনেক কিছু ব্যক্তিগত ও আত্মবিশ্লেষণধর্মিতার মধ্য দিয়ে। কবিতার ধীর গতির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ধারণায় নিজেরা আত্মস্থ হই। সময়ের এই ধারণা বয়ে নিয়ে আসে Rudyard Kipling-এর গল্প They. অনেকটা বিটোভেনের সাঙ্গীতিক মূর্ছনার মতনই অনুভূতি ও দৃশ্যগ্রাহ্যতা এক হয়ে যায়। সমগ্র কবিতায় অনুভূতি ঘিরে থাকে। Kipling-এর গল্পটির সঙ্গে জড়িত হয়ে যায় ফুল সম্পর্কিত আলোচনা, মেঘ আসার আগেই পদ্ম প্রজ্জ্বলিত হয় সূর্যরশ্মিতে। সময়ের বৃত্তে এটাই বোধ হয় অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় চলনে এক কাব্যিক সৌন্দর্য অভিজ্ঞতার সামগ্রিকরূপ দেয়। চলন ও নিশ্চলতার সম্পর্ক ও সেই মূহূর্ত যা সময়ের মধ্যে না থেকেও অস্তিত্বের জানান দেয় তা কবিতায় ধরা পড়ে। দ্বিতীয় চলনের কেন্দ্র বিন্দু অনন্ত কিম্বা নিশ্চল বিশ্বাস বা ঈশ্বর—"the still point of the turning world". তৃতীয় চলনে আকস্মিক পরিবর্তন থাকে। বাগান ও প্রকৃতির ভাবমূর্তির পরিবর্তে এক পরিবর্তণীয় জগতের দেখা পাওয়া যায়। আমরা এক ভূগর্ভ ট্রেনের নৈশযাত্রী হই এবং এলিয়ট ক্লান্ত যাত্রীদের ঘরে ফেরার এক বিস্তৃত চিত্র উপস্থিত করেন। লণ্ডনের সেতুর

উপর নিজস্ব একান্ত নির্জনতায় আবদ্ধ লোকেরা ঘুরে ঘুরে যায়। দ্বিতীয় স্তবকে ভূগর্ভ ভ্রমণের ক্লান্তিকে অতিক্রম করে অন্য এক বাস্তব সত্য প্রকাশমান হয়। মনে হয় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চলন যা কোথাও আরম্ভ হয় নি, কোথাও নিয়ে যায় নি, যাবে না—সেই বাস্তব বোধে আমরা ফিরে আসি। দুঃখের এক অভিজ্ঞতা আর আনন্দ অতীত ও ভবিষ্যত সময়ের দাসত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়। চতুর্থ চলনে হৃদয়ের গভীরতম রাত্রি দেখা দেয়। সুন্দর গীতিময় চলন আমাদের বাগানে নিয়ে যায়। আমরা অপেক্ষা করি জীবন অথবা মৃত্যুর স্পর্শের। শেষ চলনে প্রথম চলনের ধারণাই ফিরে আসে। সময় ও চলনের চিন্তা দিয়ে আবার শুরু হয় এক প্রয়োজনীয় বুনট প্রস্তুত করা। সূর্যরশ্মি প্রকাশমান হয়, ধুলো বিপর্যস্ত হয়, অবোধ আনন্দ হৃদয়কে ছেয়ে দেয়। আর তাই সময়ের ধারা মনে হয় অবাস্তব। উজ্জ্বলতার মুহূর্তগুলিকে শুধুমাত্র আগে ও পরে বিস্তারিত করেই সে পথের নিশানা থেমে যায়।

Burnt Norton সময়ের চারটি ধারণাকে প্রথমেই গ্রথিত করে দেয়, চার কণ্ঠ যেন প্রথম স্তবকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমেই সময় ঘটনাসমূহের চিরন্তন শৃঙ্খল—এই ধারণাটি স্পষ্ট হয়—"Time present and time past." দ্বিতীয়তঃ দেখানো হয় সময় চিরন্তনভাবে বর্তমান, সুতরাং এর বন্ধনমুক্তি সম্ভব নয় কারণ, সময়ের বোধ ইতিহাস, ক্রমোন্নতি ও প্রবাহের মধ্যে পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ সময় হলো ঘটনা সমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়ে যাওয়া। শেষপর্যন্ত এই সম্ভাবনাগুলিকে এক মহিমান্বিত উদ্দেশ্যে তিনি পর্যবসিত করে দেন। মূল সমস্যাটি সময়ের অস্পষ্টতাকেই চিহ্নিত করে। একইভাবে অতীত স্মৃতি বর্তমানকে মুছে দেয় এবং এর সাথে ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা মানবজীবনে নূতন মাত্রা এনে দেয়। প্রথমেই এক বৈপরীত্য কবিতার মূলভাবকে ধরে রাখে। অনেকটা অমূর্ত বোধ ও বাগানের এক অভিজ্ঞতা আর চেতনার বোধ ও তার রূপায়ণের পার্থক্যটুকু স্পষ্ট হয়। Murder in the Cathedral-এ অব্যবহৃত অধ্যায়টির অংশ Burnt Norton-এর প্রথমেই এই স্তবকটিতে ফিরে আসে। অনন্ত মুহূর্তের কাছে সময়ের বিশেষ মুহূর্ত ছেদ সূচনা করে। প্রতীক ধর্মিতার মাধ্যমে অবশ্য অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন দেখাতে চান নি এলিয়ট। তাই এই জগত পুরোপুরি ভাবার স্পষ্ট নয়। সামগ্রিক যে অভিজ্ঞতায় সময়ের ধারণা উঠে আসে, সেখানেই তিনি তাঁর আবেদন রাখেন। যে অভিজ্ঞতায় সময়ের সীমবদ্ধতা ও তার থেকে দূরে থাকা— এই দুই ভিন্নধর্মী মানসিকতার সায় পাওয়া যায় তা একদিক থেকে ধর্মীয় বোধ আনে। প্রথম স্তবকে যেন সতর্কভাবেই 'perhaps' ও 'If' শব্দ দুটিকে প্রবেশ করানো হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্যের যুক্তি প্রাথমিক ইতস্ততঃ ভাবকে এক দৃঢ় বোধে উপস্থিত করে। মূল ধারণাটি বর্ণিত হয়—" All time is unredeemable"-এই অভিব্যক্তির মাধ্যমে।

অনেকটা Ash wednesday-তে ব্যবহৃত আশাবাদী ধারণা ঘুরে আসে—

Redeem
The time. Redeem
The unread Vision in the higher dream.

আমরা সচেতন হই যে সমস্ত সময় চিরন্তন ভাবে বর্তমান। এই বোধের থেকেই আশ্বস্ত হওয়া যায় যে দৃষ্টবস্তুর ধারণা ও বিফলতা সুদূরের পরিতৃপ্তির জগতে অর্পণ করা যায় না। এক অস্বস্তি নূতন রূপ নেয়—

"What might have been an what has been
Point to one end, which is always present."

ব্যবহারিক জগত ও কল্পজগতের পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। প্রেতাত্মারা তাই হেঁটে যায়, তাদের পদধ্বনি স্মৃতিতে প্রতিধ্বনিত হয় সেই স্থান ও দরজার সম্মুখে যা কখনও খোলা হয়নি। যে ভাবমূর্তি উপস্থিত হয় তা যেন অনেক বন্ধ দরজা উন্মোচিত করে দেয়: কোনো ব্যক্তিগত জগতে সেগুলি যেন সুসজ্জিত শৈশব স্মৃতি মনে করায়। আবার কল্পলোকের কল্পনাপ্রসূত নকশাকেও উন্মোচিত করে। আবার একইভাবে এই অনুরণন সাহিত্যানুগ স্মৃতি মনে করায়। অর্থাৎ পদধ্বনি, দীর্ঘ দালান, গোপন বাগানের দরজা, গোলাপ বাগান—এই ভাবমূর্তিদের সমস্ত সম্ভাব্য দিক আলোচনায় উপজীব্য হয়। Burnt Norton লেখার আগে এলিয়ট St. Augustine এর Confessions পড়েছিলেন। সময় ও স্থানের অসংলগ্ন দুটো মনের মধ্যে নৈকট্য যেন তাই গভীরভাবে প্রকাশ পায়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সর্বশেষ সমাপ্ত অনুবাদ কবিতা টি, এস, এলিয়ট-এর বার্ণ্ট নর্টন-এর প্রথম অনুচ্ছেদের দুটি লেখন। টি. এস. এলিয়ট-এর কবিতার অনুবাদ অবশ্য **প্রতিধ্বনি**-র সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল পর্যায়ে অনুপস্থিত। এর অর্থ এই নয় যে এলিয়ট-এর মূল্যায়ন তিনি ঠিক ভাবে করতে পারেন নি। জীবনের শেষ পর্বের এক সাক্ষাৎকারে সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন - "আজকালকার পাশ্চাত্য লেখকেরাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। একমাত্র এলিয়টই পরিণতির দিকে প্রাগ্রসর।" তাঁর সাহিত্য সমালোচনায় এলিয়টের উল্লেখ ঘুরে ফিরে এসেছে। হয়ত ক্রোচের নান্দনিক ধারণায় উক্তি ও উপলব্ধির মিলটুকু তাঁকে ভাবিয়েছে: তারই সামঞ্জস্য যেন তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছেন এলিয়ট-এর বার্ণ ট্ নর্টন-এর প্রথম অনুচ্ছেদের দুটি লেখনের মধ্যে। কিন্তু এই দুটি অনুবাদ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত "কবিতা" পত্রিকায় এই দুটি লেখন প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির দিক থেকে সাড়া পাবার আগেই মুগ্ধ চৈতন্য যে কবিতাটির মহত্ব মেনে নিয়েছে সেটা অনুবাদের মধ্যে বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। সনাতন মানবসত্য পরিবর্তনকে সজীব রাখে। সাহিত্যের মূল সমস্যা আর দর্শনের সনাতন প্রশ্নকে তিনি মিলিয়ে

নেন অনুবাদের মধ্যে। এক মহাচৈতন্যের অঙ্গীকার তিনি খুঁজে পান বার্ণ ট্ নর্টন-এর প্রথম অনুচ্ছেদে। একইভাবে পাঠকের চৈতন্য জাগানোর যে চেষ্টা তাঁর নিরন্তন বোধ ছুঁয়ে ছিল—তা যেন রূপ পায় অনুবাদের ক্রিয়াশীলতায়। তিনি জানেন কবিতার গঠন প্রত্যেক পংক্তি বিশ্লেষণ করেও ধরা যায় না। তাই ভাবাবেশও খণ্ডাকারে না থেকে সমগ্রের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। টানাপোড়েনের ক্ষেত্র এই দেহমনোভূমি। সুধীন্দ্রনাথের নিরন্তর সাধনা ছিল আত্মোপলব্ধি। আর তাই কবিতার অনুবাদ নিজস্ব প্রভাব ও অভিঘাতের সামিল হয়ে যায়। এক ধারে ক্ষণকালীন ও শাশ্বত রূপ চিত্রিত করেন বার্ণট্ নর্টন-এর প্রথম অনুচ্ছেদের দুটি অনুবাদে।

শুধুমাত্র আবেগবহুল নয় এই প্রকাশভঙ্গিমা, দার্শনিক ও সামাজিক সত্যও একই সাথে প্রকাশ পেয়ে যায়। শব্দ সমূহ তাঁর কাব্যিক বোধকে সজীব রাখে। কিন্তু সমস্ত কিছুই তাঁর নিজস্ব স্বজ্ঞা ছেয়ে দেয়। ফর্মের ব্যাপারে তাঁর দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতা বেশ স্পষ্ট হয়। একধারে চিরাচরিত কাব্যিক শব্দনির্বাচনকে বেশ সাহসিকতার সঙ্গে আরও এগিয়ে দেন এবং খুঁটিনাটিভাবে ছন্দ প্রকরণ মেনে চলেন। কিন্তু আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পংক্তিগুলি সাজানো হয় অনেকটা গদ্যশৈলীর যুক্তিসম্মত বিন্যাসের মাধ্যমে; চিন্তাকে তিনি মেলে ধরেছেন কাব্যময়তায়। কিন্তু অনুভূতি অস্বাভাবিকভাবে বুদ্ধিদীপ্ত রয়ে যায়। এই যে অসঙ্গতি তা হয়ত তাঁর মানসিকতারও প্রতিফলন। অনুবাদের ছন্দে সুধীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্য আনেন নিজস্ব ভাবে। আক্ষরিক অনুকরণকে বর্জন করে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমেই নূতন ব্যঞ্জনা বাড়িয়ে তোলেন। অনেক সুবিধাবাদী প্রকরণ অনুবাদের ক্ষেত্রটিকে সচল রাখে;

শব্দতত্ত্ব ও ছন্দশাস্ত্রে সুধীন্দ্রনাথের স্পষ্টতা স্বাকার্য। কিন্তু অনুবাদে সংস্কৃত-আশ্রিত শব্দ, ভাবনাকে ছন্দ দিয়ে প্রকাশ করতে গেলে যে সমস্যা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, সে ব্যাপারে তিনি হয়ত অন্য ধারণা পোষন করতেন। শব্দ সমূহের প্রাঞ্জলতার উদাহরণ হিসেবে অন্য শব্দ সমূহকেও ভাবা যেতে পারে। অবশ্য অনুবাদে সংহতি ও গাম্ভীর্যটুকু স্পষ্ট। "কাব্যের ভাষা যেমন অকৃত্রিমতার কণ্ঠস্বর, কাব্যের ছন্দ তেমনই অকৃত্রিমতার পদধ্বনি"—একথা বলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। এলিয়টের কাব্যে একধরণের ছন্দের নমনীয়তা ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে। সাধারণতঃ একটি পংক্তির চারবারের শ্বাসাঘাত এবং মধ্যের বিরতি এই ছন্দের মধ্যে এক নূতনত্ব এনে দেয়।—

Tim´e pre´sent/and ti´me pa´st
Are bo´th perhaps pre´sent/in ti´me fut´ure
And tim´e fut´ure/ cont´ained in time pa´st

তৃতীয় পংক্তির পাঁচবারের শ্বাসাঘাত স্বাভাবিক ভাবেই উপস্থিত হয়। এই পংক্তিতেই মূল ধারণাটি স্থায়ী বোধে পর্যবসিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে

কিছু পংক্তির শ্বাসাঘাত ভিন্নধর্মী বলে মনে হবার কারণ অবশ্য থেকেই যায়। এলিয়ট তাঁর কাব্যের মধ্যে ঋজুতা, কাব্যিক নিয়ম মেনে চলার প্রতি আস্থা দেখালেও Burnt Norton-এ এক স্বাধীন প্রকাশ শক্তিকে ভিন্নধর্মী ধারণায় একত্রিত করেন এক অনায়াস মানসিক প্রস্তুতির দ্বারা। আর সুধীন্দ্রনাথ এই অনুবাদে পয়ারের কাঠামোর উপর নির্ভরশীল অমিল, প্রবহমান ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ৬, ৮ ও ১০ মাত্রার পর্বভাগ এক ধীর লয় এনে দেয়। এলিয়ট তাঁর কাব্যে যে ধরনের সাঙ্গীতিক বিন্যাস দেখাতে সচেষ্ট ছিলেন তা কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ-এর অনুবাদে স্পষ্ট হয় না। বাংলা পদ্যের অনুবাদে সুপ্রচলিত যথেচ্ছাচার কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় তিনি নূতনত্ব আনেন।

নিঃসঙ্গ যুগ মানবতার কবি এলিয়ট

প্রেমানন্দ প্রধান

এক যুগ-সন্ধিক্ষণে কবি এলিয়টের আত্মপ্রকাশ। ব্যক্তিগত জীবনের প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে তিনি যুগ-চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন নি। স্কুল জীবন থেকে সুরু করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। লণ্ডনের ইমেজিষ্ট বা প্রতীকবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এজরা পাউণ্ড, হিল্ডা ডু-লিটল্, রিচার্ড অলডিংটন প্রভৃতি কবিদের কাছ থেকে তিনি প্রথম পাঠ নিয়ে জীবনকে দেখতে শুরু করেছিলেন এক কৌণিক মানসিকতার প্রভাববৃত্তে। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখের আত্মীকরণ ঘটিয়ে তিনি নিঃসঙ্গতাকে জীবনের মতোই ভালবেসেছিলেন; মনের গভীরে অনুভব করেছিলেন জীবনের হাহাকার, অসংখ্য কালো ছায়ার মিছিল। ভিভিয়েন হেই উডের সঙ্গে তাঁর প্রণয় ও বিবাহ কোনদিন সুখের হয়নি; হেই উডের প্রাণ-প্রাচুর্য, লঘু-চপলতা, অভিনয় ক্ষমতা, অশ্লীলতা, নিষ্ঠুরতা, নিস্পৃহতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, এক কথায় তাঁর চরিত্রের রহস্যময়তা এলিয়টকে পীড়িত করেছিল প্রচণ্ডভাবেই। প্রথম জীবনে স্কুলশিক্ষকের চাকুরি তাঁর কাছে 'শুধু প্রাণ-ধারণের, শুধু দিন-যাপনের গ্লানি'। গৃহপরিবেশে মানসিক ব্যধিগ্রস্তা স্ত্রী, দিনভর ব্যাঙ্কের যান্ত্রিক পরিবেশে করণিকের কাজ তাঁর নিঃসঙ্গতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষভাবেই সাহায্য করেছিল। স্বদেশে-বিদেশে চির-নিঃসঙ্গ কবি ইংলণ্ডে এসেও ইংরেজ পরিবারে অবস্থানকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেন নি। যে এলিয়টের মনে ঘুমন্ত বিস্ববিয়সের আক্ষেপ ও জ্বালা, হৃদয়ে ওয়েষ্টল্যাণ্ডের অনুভূতি—সেই কবি তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রতিষ্ঠাতেও ছিলেন অনুত্তেজিত। সমালোচকদের কাছে তিনি পরধন-লোভেমত্ত মধুকর। কবিবন্ধু এজরা পাউণ্ডের আর্থিক অনুদান প্রচেষ্টা তাঁর কাছে কারুণ্য প্রদর্শনের বিপ্রতীপ মানসিকতায় ছিল জর্জর। জীবন্মৃত স্ত্রীর মৃত্যু তাঁর কাছে আপাত-মুক্তি বলে পরিগণিত হলেও মনে ছিল বেদনার রেশ। গৃহবন্দী এজরা পাউণ্ডের উন্মাদগ্রস্ততায় তিনি মানসিক সংস্থিতি হারিয়ে এই জরাজীর্ণ ভঙ্গুর পরিবেশে সম্ভবত জীবনের অর্থ খোঁজার বাসনায় সত্তরের কোঠায় সংবেদনশীলা যুবতী সেক্রেটারী ভ্যালেরি ফ্লেচারের সংগে উদ্বন্ধনে আবদ্ধ হলেন (১০ই জানুয়ারী, ১৯৫৭)। সমাজ ও সভ্যতার এই সংকটময় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করার তাগিদ অনুভব করলেন তিনি। বর্তমানে চারিদিকের নিরন্ধ্র অন্ধকার, জমাট বাঁধা হতাশা, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, শহুরে চাকচিক্য ও জৌলুষের নীচে ঘন ক্লেদের স্তরীভূত অস্তিত্ব

তাঁকে নিদারুণ ভাবে যন্ত্রনাকাতর করে তুললেও অতীতচারিতা ও অতীত-সচেতনতার আনুকূল্যে মানব-উত্তরণের ব্রতপালনে তিনি হলেন প্রয়াসী। তাঁর মতে, বর্তমান যুগের অবক্ষয়ী মানসিকতা অতীত থেকে বিচ্যুত বা সম্পর্কহীন নয়। তবে বর্তমান প্রজন্ম আত্মশুদ্ধির প্রাকরণিক মধ্যস্থতার অভাবে নিবীর্যে ও নিষ্ক্রিয়তায় ঘণীভূত হয়ে একপ্রকার মানসিক দীনতায় দীর্ণ। হতাশ সৈনিকের মতো তাদের জয়লাভের আশা অতি ক্ষীণ। মানব-মনের এই ধারা চির-বর্তমানতায় বিধৃত। শুধুমাত্র উপলব্ধির অভাবে তা বিকৃত হয়েছে পরবর্তীকালে। দান্তের 'ইনফার্নো'-তে গিডো দ্য ফন্টেফেন্ট্রার মতো প্রুফ্রক নিষ্ক্রিয়তা ও নিঃসঙ্গতাকে অস্বীকার করতে পারেনি। 'দি পোট্রেইট অব্ এ লেডি'-এর নায়িকা শীতের হিমেল পরিবেশে শেকস্‌পীয়রের নায়িকা জুলিয়েটের মতোই জীবন্মৃত ; তার কক্ষের নীরবতা জুলিয়েটের সমাধির মতোই ম্লান। কবিতাটির শুরুতেই 'দি জু অব্ মাল্টা'র অনুসরণী হিসেবে ব্যারাবাসের আত্মবঞ্চনার মুখরতা মানবমনের অবিচ্ছিন্নতার স্থরে আরোপিত। অনুরূপভাবে, 'জেরন্টিয়ন' কবিতাতেও (গ্রীক Geron = বৃদ্ধ) বেন্‌জন্‌সনের 'দি এলকেমিষ্ট' নাটকের অন্যতম চরিত্র স্যার এপিকিওর ম্যামনের বিকৃত ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করার বাসনারই পুনরাবৃত্তি। এই কবিতার মূলসুর শেকস্‌পীয়রের 'মেজার ফর মেজার' নাটকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ক্লডিওর উদ্দেশ্যে ডিউকের বাণীতে জীবনের চরম অর্থহীনতার ইঙ্গিতে দ্যোতিত। 'Here I am an old man in a dry month'—উক্তি এডওয়ার্ড-ফিট্‌জেরাল্ডের 'ওমর খৈয়াম'-এর প্রতিধ্বনিতে অনুভাবিত। এ যেন যীশুর সমকালীন মানুষের অবিশ্বাস, অলৌকিকের প্রতি মোহাচ্ছন্নতা ও অন্ধবিশ্বাস, জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতা ও হঠকারিতারই অনুকৃতি। বর্তমান চিহ্নিত হয়েছে অতীতের কার্যধারায়। অতীতের বিক্ষুব্ধ, বিপর্যস্ত জীবনে যে অনুশোচনা ও ধর্মবোধ প্রাণের আবেগে, চেতনার ঔজ্জ্বল্যে মহীয়ান হয়ে উঠত, এই যুদ্ধোত্তর যুগে তার কি নিদারুণ অবক্ষয়। বতমান যুগে প্রসার নেই, অন্তঃসারশূন্যতা এর অঙ্গে অঙ্গে। প্রতি মুহূর্তের এ যুগের মানুষ যেন শেষ মুহূর্তে উপস্থিত। আপন অস্তিত্বরক্ষায় সদা আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ আপন দৃষ্টিকে ভিতরে বাইরে চালিত করার ক্ষমতা হারিয়ে ছক-বাঁধা জীবনের হৃদয়হীনতা ও স্থবিরতায় স্বস্তি খুঁজে চলেছে। দুটি বিশ্ব মহাযুদ্ধের অবসানে পচা গলা সমাজ ও সভ্যতার কংকাল-স্তূপে গড়ে উঠেছে এক অনাবাদী প্রান্তর। সে প্রান্তরের অধিবাসীরা প্রতিযুগের ব্যভিচার ও যৌনবিকার থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষায় আপন আপন হৃদয়ে ধর্মসাধনা, প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ, অনুশোচনা বা বেদনাবোধের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলনে অনাকাঙ্ক্ষী। সর্বযুগের বন্ধ্যা সভ্যতার আগ্রাসী পরিবৃত্ত থেকে বর্তমান যুগ যে স্বতন্ত্র নয়—এই বোধশক্তি-হীনতা এ যুগের মানুষকে মৃতকল্প করে তুলেছে। সব কালই (age) বর্তমানের

অনুস্থতি, এবং পৃথিবী ও কাল সমসাময়িক। তাই পৃথিবীতে নব-প্রজন্মের অভ্যুত্থানের পরিবর্তে সংঘটিত হয় পুনরাবৃত্তি। প্রয়োজন শুধুমাত্র সংঘটণে উপযোগী মানসিকতা। রাড্ইয়ার্ড কিপলিং এর 'They' গল্পের—ধ্যানধারনা থেকে মুক্তি পেতে হলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সীমারেখা মুছে ফেলে গ্রহণ করতে হবে এক ও অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘায়িত বর্তমানকে—যা সামনে পিছনে অনির্দিষ্টভাবে প্রসারিত।

বর্তমানের এই বিকৃতিকে এক সার্বজনীন সৌষ্ঠব দান করাই ছিল কবি এলিয়টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমান জীবনের সত্যকে কাব্যসত্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তিনি যত্রতত্র ব্যবহার করেছেন তাঁর পূর্বসূরীদের চিন্তা, পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে। ম্যাথু আর্নল্ড-এর 'Intellectual deliverence' বা বৌদ্ধিক উত্তরণ এবং বৌদ্ধধর্মের 'moral deliverence' বা নৈতিক উত্তরণ এর আঙ্গিকে ঐতিহ্য (Tradition) ও ব্যক্তিগত প্রতিভা (Individual Talent) কে বনিয়াদ করে তিনি মানব-মুক্তির পথনির্দেশে তৎপর হয়েছেন এক ব্রতপালনী নৈষ্ঠিকতায়। তাই এলিয়টের কাব্যে ও মননে অবক্ষয় ও সংস্কারচেতনার দ্বান্দ্বিক মিলন সংঘটিত হয়েছে প্রতীকের বাতাবরণে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঐতিহ্যাশ্রয়ী অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রূপান্তসঙ্গ লাভ করে বর্তমানের দীনতায় প্রকটিত হয়। এই বর্তমানকে শাশ্বতকালের ব্যাঞ্জনা দান করতে হলে চিরকালীন কংকালের উপর বনিয়াদ করে অনুভূতির স্তরে একটি সুন্দর সুডৌল অবয়বের রূপকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। স্যর জন্ ডেভিসের মিষ্টিক চেতনায় নিরাসক্তির শহর লণ্ডন দান্তের ইনফার্ণোর মতো হতাশা ও নিঃসঙ্গতার গভীরে ক্রমপতনোন্মুখ হলেও সন্ধ্যার পটভূমিকায় সেখানে মৃত্যুশোকের উদ্বোধন ঘটবে ইউ ফুলেক প্রস্ফুটনে। কিন্তু মৃতরা মৃত্যুহীন; যারা প্রাণবান, কেবলমাত্র তারাই—মরতে পারে—'That which is only living Can only die'. বাস্তবিক, সৃষ্টি শব্দ ও সংগীত চরম নীরবতার মধ্যেই বিরাজ করতে পারে। কীটসের গ্রীসদেশীয় আর্ন চরম নিস্তব্ধতায় মৃত্যুহীন; নির্জন আত্মস্থতায় তার পূর্ণতার (Logos) জীবনবেদ। এ আর্ন কালের অতীত। এলিয়টও মনে করতেন, গতিশীল বাসনার উপচারেই যে প্রেমের পরিণতি, Logos বা word এর সাহায্যে তাকে গতিশীল রাখতে হবে 'জীবনে জীবন যোগ' করার তাগিদে। জীবনের সংগে মৃত্যু যেমন অন্বিত, তেমনি মৃত্যুও নব-জীবনের দিশারী—'In my end is my beginning In my beginning is my end'. আপাত সংঘাতের মধ্যে এই দ্বান্দ্বিক মিলনের সূত্রেই এলিয়টের 'Circular movement তত্ত্বের গুরুত্ব। পূর্বপুরুষদের গ্রাম ইষ্টকোকারে বহু শতাব্দী পরে এলিয়টের প্রত্যাবর্তন তাঁর মনে এই ধারনাকে বদ্ধমূল করেছিল। থিয়েটারে পরিবর্তিত দৃশ্যপটের জন্য অন্ধকারে প্রতীক্ষারত দর্শকের অথবা লণ্ডনের ভূগর্ভ-রেলের

গতিবেগ সঞ্চারের আশায় অপেক্ষমান যাত্রীর অথবা অপারেশন টেবিলের সামনে রোগীর মতো আমাদের সকলকেই শৈশবের উজ্জ্বল আলোকবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে যৌবনের চরম নিঃসঙ্গতায় অন্ধ আমসনের মতো অপেক্ষা করতে হয়—'O dark, dark, amid blaze of noon'! কবির মনে হয়—'The whole earth is our hospital'.

কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইউরোপের অবক্ষয়ী মানসিকতা মানুষের যৌনবিকার ও ব্যভিচার, পাপ ও সীমাহীন ঔদ্ধত্যে মনুষ্যত্বের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যর্থকাম। বাঁচার অঙ্গীকারে ঋদ্ধ না হয়ে এ যুগের মানুষের মৃত্যুই একান্ত কাঙ্ক্ষিত। যৌবনলাভে বঞ্চিতা নারীর মৃত্যুকামনা পেট্রোনিয়াসের 'স্যাটিরিকন'-এ বর্ণিত হলেও বর্তমান যুগের মানুষের জন্ম থেকেই, এমন কি পূর্ণ যৌবনেও, মৃত্যুকামনা একান্তই বিরল। যৌনসম্ভোগ এ যুগে একটি অভ্যাস; চাহিদা পরম যান্ত্রিকতায় একটি ব্যবসামাত্র। জীবনের অন্ধগলিই এ যুগের মানুষের কাছে রাজপথ। বিপরীত লিঙ্গতার সমন্বয়ী সৃজনক্ষমতা আজ যান্ত্রিক মানসিকতার অভিক্ষেপে সমকামিতায় পর্যবসিত। মানুষের ক্রমক্ষীয়মান বিশ্বাসবোধ, বিশুদ্ধপ্রেম, সীমাহীন নৈরাশ্য—দুঃখ-যন্ত্রনা অনুতাপের রুদ্র দাহনে পরিতৃপ্ত না হয়ে পরম উন্মার্গগামিতার পথে ধাবমান। 'দি ক্যান্টার বেরী টেলস'-এর কবি চসার-এর এপ্রিলে প্রকৃতির নবজীবন লাভের সম্ভাবনা বেদনার আনন্দে উচ্ছসিত। শেকসপীয়রের 'দি টেম্পেস্ট' নাটকে উর্বরাশক্তির প্রতীকে সুন্দর পুনর্জন্মের প্রতিশ্রুতিতে ফিনিশীয় নাবিকের জলে বিসর্জনের কাহিনী এরিয়েলের মুখে বর্ণিত হয়েছে। মধ্যযুগে 'হোলি গ্রেইল'—এর পেয়ালা, বর্শা, তরবারি ও পিরিচ নারী যৌনাঙ্গ ও পুরুষ যৌনাঙ্গের সংগে প্রতীকাত্মক ছিল। শষ্পবিহীন পর্বতের সুন্দরী রমণীর সদাসচেতন সম্ভোগেচ্ছা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'ম্যাডোনা অব্ দ্য রক'-এ পরিণতি লাভ করেছিল। কিন্তু এই যুদ্ধোত্তর পটভূমিতে এক চক্ষু স্মার্ণা ধর্ম ও যৌনজীবনকে একসংগে আমদানী করলেও ধর্ম এখন নিঃশেষিতপ্রায়, যৌনজীবন বল্গাবিহীন। আনন্দ-হীন, বৈচিত্র্যহীন, কৌলিন্য বিবর্জিত এক পেশে জীবনের মিছিলে যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষ প্রাণশক্তি হারিয়ে যান্ত্রিকতার শিকার হয়েছে। মৃতের সমাধি আজ দেবতার পুনরভ্যুত্থানের কথা ঘোষণা করে না; আত্মার জ্যোতির্ময় সত্তার উদ্বোধনের আকাঙ্ক্ষায় কোন গীর্জা থেকে প্রার্থনা সংগীত ভেসে আসেনা। ঘণ্টাধ্বনি, প্রার্থনা—এগুলি তালিকাভুক্ত উপাদান মাত্র। বর্তমান অনাবাদী জমির বাসিন্দারা দৈহিক ও মানসিক সক্রিয়তা হারিয়ে বেদনার হলাহলে মোহাচ্ছন্ন। নিষ্ফলের সমারোহ সম্ভাবনাহীন পাথুরে জীবনে কদর পেলেও সভ্যতার উন্নতিতে কোন ভাবেই সাহায্য করে না। জীবনের শুরুতে মৃত্যুর যে ঘণ্টাধ্বনি পিছনে, জীবনসায়াহ্নে তা মানুষের সামনে। ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র 'একমুঠো ধুলি' (haudful of dust); এজিকেইল বর্ণিত 'মৃত-গাছ'

(dead tree) ও শুকনো হাড় (dry bones) মুক্তির-আকাঙ্ক্ষাহীনতায় দ্যোতিত। ঘেসো ফড়িং, ঝিঁঝি পোকা আবেগহীন, গতানুগতিক জীবনের প্রতি অনুগামিতার প্রতীক। তেমনি 'রক্তিম শিলা' (red rock) ক্রুদ্ধ ঈশ্বরের, 'বিধ্বস্ত কোরিওলেনাস' (broken coriolanus) মদমত্ত মানুষের আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের, 'ভাঙ্গা আঙুলের নখ' (broken fingernails) যুদ্ধোত্তরযুগের অন্তঃসারশূন্যতার, পতনোন্মুখ লণ্ডন ব্রিজ (London Bridge falling down) যুগপ্রাচীন সভ্যতার ক্রমবিনাশের এবং 'সময়ের বিশুষ্ক কর্তিত মূল' (withered stumps of time) সৌন্দর্য ও মহতী ভাবনার প্রতি অনীহার প্রতীকে বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। টিরেনিয়াস বর্ণিত জার্মান রাজকুমারীর ব্যক্তিগত বিনোদন-বাসনা পূরণার্থে ইতালী যাত্রা এ যুগের অবক্ষয়ী মানসতারই পরিপূরক। এ যুগের স্বতঃউৎসারিত হতাশা ও নৈরাশ্য আহত সার্জেনরূপী যীশু ও মুমূর্ষু শুশ্রূষাকারিণীরূপে চার্চের-প্রতীকে বিধৃত হয়েছে। আদমের পাপে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল, সে পাপ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে বয়ে চলেছি। 'সুইনি অ্যামাং দি নাইটিংগেল' কবিতায় সুইনির চরিত্রে বিশ্বাস-ঘাতিনী ক্লাইটেমনেষ্ট্রার দ্বারা নিহত অ্যাগামেমননের মানসিকতা আরোপিত হয়েছে। গ্রীক রূপকথার নাইটিংগেল স্বাধর্ম্য হারিয়ে বর্তমান যুগের সাধারণী ভাষার আঙ্গিকে 'গণিকা' মাত্র। প্রাচীন মিশরের অ্যাডোনিস ও অ্যাফ্রো-দিতির মূর্তির পাদদেশে প্রাণ-শক্তির দ্যোতক হিসেবে অরিয়ন ও সিরিয়স মিশরের ঊষর বালুভূমিতে আনতে চেয়েছিল কমলালেবু, কদলী ও পানশালার জন্য দ্রাক্ষার সমারোহ। বর্তমানে অরিয়ন অন্ধকারে আবৃত; সিরিয়স মেঘাচ্ছন্ন। নীলনদ আজ স্তব্ধ, ভারাক্রান্ত। ম্যাকবেথের প্রাসাদে নিহত হবার জন্য স্কটল্যাণ্ডের রাজা ডানকানের আগমন দাঁড়কাকের অশুভ ধ্বনিতে সাংকেতিত। সুইনির জীবনেও সেই অশুভ ছায়ার প্রলম্ব অভিক্ষেপ। সুইনির অস্তিমলগ্নে নাইটিংগেলের নিস্পৃহতায় ডায়ানার পবিত্রকুঞ্জে বাঁকা চাঁদের নির্দেশে বৃদ্ধ পুরোহিত অ্যাগামেমননের হত্যাকাণ্ডের ছায়াবৃত্তে আজও সংঘটিত হয় একই সংগে নাইটিংগেলের গান ও বিষ্ঠাত্যাগ। অ্যাগামেমননের হত্যার পরিণতি-পর্বে নতুন পুরোহিত নির্বাচনের মধ্যস্থতায় নব-জীবনে উত্তরণের প্রয়াস হিসেবে হয় চিহ্নিত। কিন্তু বর্তমানের নিষ্ফল অনুকৃতিতে যীশুর ক্রুশ কাষ্ঠে প্রাণবিসর্জন অস্বীকৃতির দৌর্বল্যে চরম সম্ভাবনাহীনতায় বিরাজিত। এখন বসন্ত ঋতুতে গাছ-পালা ফুলে-পত্রেপুষ্পে সম্ভাবিত হয় না। আজ শুধু জুডাস ফুলের সমারোহ। মাটির উর্বরতার সংগে সম্পর্কিত 'হোলি গ্রেইল' (যথার্থ রক্ত) এখন মধ্যযুগের নাইট স্যর গ্যালাহাড, স্যর পার্সিভ্যাল বা পার্সিকালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সারা দেহে দুষ্ট ক্ষতের অধিকারী যৌন অক্ষম ফিশার কিং-এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত। ওয়েষ্টল্যাণ্ড বা পোড়ো জমির এই রাজার যৌন জীবন স্বাভাবিক উৎপাদন প্রত্যাশায় নিয়োজিত না হয়ে পশুসুলভ

উল্লাসের মাদকতা তথা কারুণ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। সোফোক্লিস-রচিত 'দি ইডিপাস রেক্স'-এর টিরেসিয়াসের অজ্ঞানতাজনিত পিতৃহত্যার ও মাতাকে বিবাহের অপরাধে তার রাজ্য থিবস্-এ অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সংঘটিত হলেও তা আনুসঙ্গিক অনুতাপ ও অনুশোচনার দাবানলে আপন চক্ষু উৎপাটন প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধি লাভ করেছিল। এই টিরেসিয়াস অতীত ট্রাডিশন থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে বর্তমানের অবনমনে সাহায্য করেননি, বরং এই অর্ধনারীশ্বর ভবিষ্যৎ প্রবক্তা সর্বজনীন বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহাকালের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অনুরূপভাবে, 'দি ওয়েষ্টল্যাণ্ডে'-এ এজিকেইল ইস্রায়েলের অধিবাসীদের পৌত্তলিকতা ও অশুভ কর্মের প্রতি অ্যাত্যন্তিক প্রবণতা লক্ষ্য করে সংক্ষুব্ধ, বেদনাহত। এলিয়টের বিশ্বাস, ঘটিত ও ঘটমানের পারম্পর্যে, প্রতীকী আবেদনের মধ্যস্থতায়, মহাকালের ধারায়, ঐতিহ্যের আঙ্গিকে যুদ্ধোত্তর যুগের নিষ্ক্রিয়তা জড়ত্ব ও নিঃসঙ্গতার বৌদ্ধিক উত্তরণ সম্ভব':

"Time past and time future
What might have been and what has been
Point to one and, which is always present."

কবি এলিয়ট ঐতিহ্যাশ্রয়ী অতীত ঘটনার রূপানুসঙ্গেবর্তমানের মাত্রাতিরিক্ত হীনতাকে চিহ্নিত করেছেন। হোয়াইট ম্যাসন নাম্নী এক বিধবা যুবতীর কাছে প্রৌঢ় প্রুফ্রকের কুণ্ঠিত নিষ্ক্রিয় প্রেম 'I'm old' কথায় প্রকাশিত। 'you' এর 'I'—প্রুফ্রকের এই দ্বৈত মানসিকতার টানাপোড়েনে কল্পনা ও বাস্তবের প্রতীকী সৌন্দর্যে অনুপম উজ্জ্বলতায় বিধৃত। সেখানে পলায়নী মনোবৃত্তি নেই, আছে পরম স্বীকৃতির মাধ্যমে চলার পথের সুস্পষ্ট নির্দেশ। বিষন্ন প্রাক-সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে অপারেশন টেবিলে ক্লোরোফর্ম-প্রভাব-গ্রস্ত রোগীর মতো প্রুফ্রকের অপসৃয়মান যৌবনের স্তিমিত কামনা স্বীকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত: 'And time yet for a hundred indecisions.' অভিজাত হোটেলে ব্যস্ত মহিলাদের সংস্কৃতি-সচেতনতা প্রমাণের অপচেষ্টায় ভঙ্গুর সভ্যতার ক্রমবিকাশে সূচিত। প্রুফ্রকের রক্তাক্ত অন্তরে বাহিত নীরবতা বিস্তার ও ব্যপকতার অভাবে চরম হীনমন্যতায় পর্যুদস্ত: 'I have measured out my life with coffee spoons'. কফির পাত্রে চামচের টুং টাং শব্দেই জীবনের সমাপ্তি পরিঘোষিত; পান-পর্বের উদ্বোধন একটি দুর-ক্রন্দন। ঐশ্বর্যের বেড়াজালে আবদ্ধ অন্তঃসারশূন্য উচ্চ-মধ্যবিত্তরা যেন প্রাচীর গাত্রে দৃঢ়পিনদ্ধ মাকড়সা, অথবা অভিমানক্ষুব্ধ নিভে-যাওয়া সিগারেট। কর্মারম্ভের প্রক্রিয়া তার অজ্ঞাত—'And how should I begin'? এমন কি, সামুদ্রিক প্রাণীর জীবনযাত্রাপ্রণালীর সম্যক বোধ ও কল্পনা তাকে সক্রিয় করে তুলতে ব্যর্থ—'And this, and so much more?' হৃতযৌবন পুনরুদ্ধারে সচেতন, অথচ ব্যর্থ প্রয়াসে সে ক্রন্দমান:

"I grow old....I grow old
I shall wear the bottoms of my trousers rolled."

বিরল কেশের বিকল্প হিসেবে—

"Shall I part my hair behind
I shall wear white flannel trousers."

পূর্ব প্রেমিকার বাহুবন্ধনে অর্জিত প্রেমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই অক্ষম, অশক্ত প্রৌঢ়ের অন্তরে আজও সমুপস্থিত ; সে তার মনের গ্লানি-ক্লেদ-ক্ষয়ক্ষতি ঢেকে রাখে তার অন্তরে দানাবাঁধা নৈরাশ্যের উপচার হিসেবে। লাফোর্গের Poesies-এর অনুসরণে এলিয়ট তার 'র‍্যাপসডি' কবিতায় লক্ষ্য করেন—রাত্রিকালীন শহরের রাস্তায় সজীব বাতিগুলির পাদদেশে বিস্রস্তবসনা নারীর মৃদু, নিবীর্য হাসি ; তাদের বাঁকানো আলপিনের মতো চাহনীতে আবিষ্কার করেন বিশ্বের কঙ্কাল, পচা মাখন আর আপাপবিদ্ধ শিশুদের শূন্যদৃষ্টির মিছিল। চাঁদ এখানে উদাস, বিবর্ণা, লোলচর্মা বৃদ্ধার অবয়বী—মুখে বসন্তের দাগ, হাতে কাগজের গোলাপ, আর তার পাঁপড়িতে অডিকোলনের গন্ধ। উদ্ভিন্ন যৌবন জেরাসিয়াম ফুল আজ বর্তমান যুগের ঝিমুনো মানুষের মতো বর্ণহীন, স্পন্দনহীন। মেকী সভ্যতার গায়ে শুধু নারীদেহ, মদ আর সিগারেটের গন্ধ। এ যুগের মানুষ বাতি হাতে পরম গতানুগতিকতায় হৃদয়ের বদ্ধ দরজা চাবি দিয়ে খুলে আশ্রয় নেয় শূন্য বিছানায় ; আর বাতির আলোকে সে পায় দন্তপ্রক্ষালনের নির্দেশ :

"Put your shoes at the door, sleep, prepare for life
The best twist of the knife."

'দি পোর্ট্রেইট অব্ এ লেডি'—নামে কবিতাটির প্রথমপর্ব শীতের রুক্ষ বাতাসে মোমবাতির ক্ষীণ আলোকে গৃহকোণে সমাধীর মতো নির্জন আত্মমগ্ন পরিবেশে বিদুষী অথচ অন্তঃসার শূন্য নায়িকার তদপেক্ষা তরুণ প্রেমিকের কাছে দেহসর্বস্ব, উদ্দীপনাহীন মামুলি যৌনাকাঙ্ক্ষাতাড়িত প্রেম-নিবেদনের চিত্রবিশেষ। বেসুরো প্রেমের সংগীত প্রেমিককে পরম নিস্পন্দতায় বাইরে গিয়ে ধূমপানের জন্য প্রেরণা যোগায়।

দ্বিতীয় পর্বে লাইলাক ফুলের সমারোহে বসন্তের আগমনী সংগীত ভাঙ্গা বেহালার কর্কশতায় যুবকের কানে বাজে। পার্টিতে শুধুমাত্র চা পরিবেশনের মাধ্যমে সময় অতিবাহন হেতু ক্ষুব্ধা তরুণী। অযাচিত বিভ্রান্তি উৎপাদনের প্রায়শ্চিত্ত কামনায় যুবক দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চমক-জাগানো সংবাদের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পিয়ানোর সুরে বা হায়াসিন্থ ফুলের গন্ধে খসে পড়ে এই প্রেম-উপহাস পর্বের নির্মোক।

তৃতীয় অংশে অপরাধবোধগ্রস্ত তরুণের বিদেশ যাত্রার প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয় তরুণী—ভাগ্যের অজুহাতে। নায়িকা কেবলমাত্র পত্র লিখনের

অনুরোধ জ্ঞাপনে আপন প্রেমের সার্থকতা খোঁজে। আর যন্ত্রনা, ব্যর্থতা ও উদ্দেশ্যহীনতার শিকার হয়ে যুবকটি মানবেতর প্রক্রিয়ায় আপন সত্তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়।

এই ওয়েষ্টল্যাণ্ডের মানুষ প্রেমহীন, অথচ যৌনলালসামত্ত, সদাসম্ভোগ-সচেতন। মত্যুশয্যাতেও টিষ্ট্রানের প্রেম ইস্থল্টের দ্বারা হয় উপেক্ষিত। 'হায়াসিন্থ গাল' কেবলমাত্র সাময়িক ভোগোপযোগী দেহসর্বস্ব প্রেমের উপকরণ মাত্র। শহুরে নায়িকা ম্যাডাম সোসোষ্ট্রিস আপন অপকর্মের সচেতনতায় পুলিশের ভয়ে সন্ত্রস্ত। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞতা সত্বেও সে আজ জনচক্ষুতে 'ইউরোপের সর্বোত্তম জ্ঞানী মহিলা' হিসেবে চিহ্নিত। দান্তের লিম্বোর মতো লণ্ডনের জৌলুষ সর্বস্বতার আড়ালে চরম অবাস্তবতার দগদগে দাগ। সকাল ন'টার সময় ঘণ্টাধ্বনি শুনে কেরাণীকুলের দিনগত পাপক্ষয়ের অসচেতন প্রয়াসে চরম ব্যস্ততায় লণ্ডন ব্রিজ অতিক্রমণ যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার নির্দিষ্ট ক্ষণে মানুষের পাপজাত অনাধ্যাত্মিক, অস্থিরতার প্রতিফলন মাত্র। বিবেকবর্জিত জড়, অচেতন ধর্মহীন বর্তমান মানুষ নিজের সঙ্গেও ভণ্ডামি করে, কুকুর নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে দেহটা বের করে আনলেও সে বিবেকের দংশন অনুভব করেনা। আপন ব্যর্থতা, নিঃসঙ্গতা, বিশ্বাসহীনতা ও আধ্যাত্মিক মৃত্যুর বিষ সর্ব যুগে সর্ব মানুষের মধ্যে সঞ্চারণেও সে ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রতিক্রিয়া অনুভব করে না। ডিউকের কাম-চরিতার্থতার উপচার হিসেবে দাবা খেলার অজুহাতে নারী সংগ্রহকারিনী লিভিয়া কতৃক বিয়াঙ্কার মাতাকে আটক রাখাকালীন বিয়াঙ্কাই ডিউকের দ্বারা হয় ধর্ষিতা। ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের সার্থক নায়িকার আভিজাত্যের পূর্ণমূল্য শোধ হয় দেহসর্বস্ব প্রেমলীলায় ক্লিওপেট্রা, ডিডো, আইমোজেন বা বেলিণ্ডার রোমান্টিকতা সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। গ্রীক কাহিনীর—টেরিয়াস কর্তৃক ধর্ষিত ও কর্তিত-জিহ্বা ফিলোমেলের 'জুগ' 'জুগ' কণ্ঠস্বর ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের কাছে রমণকালীন শীৎকার ধ্বনির অনুরণমাত্র। প্রেমিকের কণ্ঠলগ্না প্রেমিকা আজ আবেগহীন স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত। বর্তমানে কেশপাশের মাদকতার অনুপস্থিতিতে ফুটে ওঠে গ্রীক মদ্য-দেবতা ব্যাকাসের শিষ্যা মেনাডের প্রতিচ্ছবি। প্রেমিক-প্রেমিকার আলাপ আজ অর্থহীন প্রলাপের অন্য নাম; শূন্য তাদের মন, শূন্য তাদের হৃদয়, শরীরে তারা পঙ্গু, কামে তারা জর্জর, মস্তিষ্কে তাদের সীমাহীন শূন্যতা। তারা 'Every man'; তারা 'hollow man'। তারা অর্থ না বুঝে বুলি আওড়ায়, তারা জানেনা তারা কী করছে বা কী বলছে। তাদের কাছে 'Nothing against nothing'। ওথেলোর অনুসরণে আবেগবিহীন 'ও ও-ও-ও!' চীৎকার শুধু অপরের নয়, নিজের হাসিরও উদ্রেক করে। অন্তরের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সে জীবন্মৃত। ঠুনকো তাদের চিন্তা, বিকৃত তাদের ভাবনা।

"What are you thinking of? What thinking, What?
I never know What are you thinking. Think".

তারপর শোনা যায়—

"I think we are in rat's alley
Where the dead men lost their bones,"

হৃদয়-শরীর-মন থেকে অসংলগ্না নারী কাজের অভাবের রাস্তায় ঘুরে আসতে চায়। প্রেমিক উত্তর দেয়—'রাত দশটায় গরম জল হলেই চলবে'। এই জীবন্মৃত প্রেমিক-প্রেমিকা জড় জীবনকে একটু সচল করার বাসনায় অপেক্ষা করে বন্ধ দরজায় কারুর করাঘাতের প্রত্যাশায়। ফিশার কিং এর মতো যৌন-অক্ষম পুরুষ আর অভিজাত রমণীর কক্ষস্থিত অবদমিত যৌন-বাসনার প্রতীকী চিত্রের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও প্রেম ও বিবাহের শোচনীয় ব্যর্থতার গ্লানি। পানশালায় বসে কৃষ্ণকায়া বহু সন্তানের জননী শীর্ণা দন্তহীনা একত্রিশ বছর বয়সের লিল অন্য নারীসঙ্গ থেকে কামজর্জর, বুভুক্ষু যুদ্ধফেরত স্বামীকে দূরে রাখবার চিন্তায় বিভোর। লিল 'হ্যামলেট' নাটকের ওফেলিয়ার মতো মৃত্যু-পথযাত্রিণী হলেও ওফেলিয়াকে লিলের মতো পুরুষের ব্যভিচারের উদ্দাম প্রবাহে চরম মর্যাদাহীনতার শিকার হতে হয় নি। প্রথম জীবনে কার্থেজ অপবিত্র প্রেমের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েও অগাষ্টাইন তিতিক্ষা ও অনু-শোচনার হোমানলে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সাধুতে হয়েছিলেন রূপান্তরিত। এডমাণ্ড্ স্পেন্সারের 'প্রথালামিয়ন' কাব্য গ্রন্থে চিত্রিত কুলু কুলু নাদিনী মৃদুগতি টেমস নদীর তীরে আজ উচ্ছৃঙ্খল, নাম না জানা মেয়ে-পুরুষদের জটলা। চারদিকে মদের বোতল, কাগজের টুকরো, রুমাল ও অর্ধদগ্ধ সিগারেটের ছড়াছড়ি। এখানে ওখানে নারী মাংসের বেসাতি, ঠিকানাবিহীন বিবাহ বিমুখ নারী পুরুষের মুক্তবিহার। শীতের শেষে রিজেন্ট খালে মৎস্যশিকারী মানুষের হাসিতে বাইবেলে বর্ণিত ইহুদীদের আর্তনাদের মতো খটাখট্ শব্দ। স্মৃতির দুয়ার ভেদ করে ভেসে আসে পিতার জন্য 'দি টেম্পেষ্ট' নাটকের নায়ক ফার্দিনান্দের ক্রন্দন ধ্বনি। খালের দু'পাশে সারি সারি বিবস্ত্র নিবস্ত্র মৃতদেহ-গুলির স্তূপের মধ্যে ইঁদুরদের হাড় নিয়ে খেলা—মানুষের আধ্যাত্মিক নিগ্রহ ও মানসিক অপমৃত্যুর ঘোষণা করে। এদিকে শ্রীমতী পোর্টার ও তার কন্যা যৌন-আবেদন অক্ষুণ্ণ রাখবার বাসনায় সোডার জলে পদ প্রক্ষালনে ইচ্ছুক। সুইনি মোটরযোগে হাজির হয় একই সংগে মাতা ও কন্যার আসঙ্গলাভের বাসনায়। ফিলোমেলার ও শিশুদের সংগীত মূর্চ্ছনা স্থবির মনে কোন সাড়া জাগায় না; টেরিয়াসের জান্তব ইচ্ছা মনের গহনে উঁকি দেয়।

সমকামিতাও এযুগের ফসল। স্মার্না থেকে এসেছে এক-চোখো ব্যবসায়ী মি. ইউজেনাইডিস্—টেরেসিয়াসের সংগে বিবৃত যৌনক্ষুধা নিরসনের উদ্দেশ্যে।

বেগুনী সন্ধ্যায় সারাদিনের কাজের শেষে ক্লান্ত টাইপিস্ট তরুণী ব্রাডফোর্ডের অসংখ্য ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত মুখ উটকো ধনী ব্যবসায়ীর সংগে নিঃশব্দে বিনা ভনিতায় কালক্ষেপ না করে সঙ্গম শুরু করে কলের পুতুলের মতো এবং সঙ্গমান্তে আয়নার সামনে উপবিষ্ট হয়ে অবিন্যস্ত কেশকে বিন্যস্ত করে গ্রামোফোনের গান শুনতে থাকে চরম নিস্পৃহতায়। গোল্ডস্মিথের 'দি ভাইকার অব্ ওয়েক-ফিল্ড'এর তরুণীর সাময়িক স্খলনের জন্য চরম অনুশোচনায় আত্মহত্যার আশ্রয় নেওয়ার কথা তার কাছে সম্পূর্ণ অভাবিত; কারণ, এ যে বর্তমান যুগজীবনেরই অঙ্গ।

ম্যাগনাস মাটায়ারের গীর্জার পবিত্র পরিবেশের পাশাপাশি জেলে-পাড়ার সস্তা হোটেল থেকে ভেসে আসে হৈ-হুল্লোড়, ভাঙ্গা ম্যাণ্ডোলিনের সুর। টেম্‌স্ আজ স্বচ্ছসলিলা নয়, তাতে তেল আর আল্‌কাতরার মিশ্রণ। সাহিত্যের স্বর্ণযুগে রাণী এলিজাবেথ ও তাঁর প্রেমিক আর্ল অব্ লিষ্টারের প্রমোদ তরণী যৌবনের উদ্দামতায় টেমসের স্রোতে ভেসে চলত রাজকীয় আত্মমর্যাদাকে ক্ষুন্ন না কোরেই। কিন্তু টেম্‌সের তীরে ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের তিন তরুণী এক্তা জঞ্জালের মধ্যে মর্যাদাহীন অবল্লিক যৌন জীবনযাপনের আঙ্গিকে বর্তমান দীন সভ্যতাকে প্রকট করে তুলেছে। হ্বাগ্‌নারের Go Herdammerung গীতিনাট্যের ওগ্‌লিণ্ড্, ওয়েলগুণ্ড ও ফ্লশিল্ড্‌এর মতো এই তিনটি মেয়েও তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ট্রাডিশনের গান গায়। কিন্তু হঠাৎ প্রথমা তরুণীর কণ্ঠে বাজে কুমারীত্ব হারানোর স্বীকৃতি:

"By Richard I raised my knees
Supine on the floor of a narrow canoe."

দ্বিতীয় তরুণীটির অসহায়ত্ব আরও প্রকট:

"My feet are at Moorgate, and my heart/Under my feet".

আর তৃতীয় তরুণীটি মারগেট্ স্যাণ্ড-এ তার কুমারীত্ব হারানোর মহড়ায় ভেঙ্গছিল আঙুলের নখ। এখন ভাঙ্গা নখের মতোই তার জীবন; এ যেন লীয়র কন্যা কর্ডেলিয়ার অভিজ্ঞতারই প্রতিধ্বনি: 'Nothing will come out of nothing', কিন্তু প্রকৃত অনুশোচনার অভাবে তাদের মুক্তি-প্রত্যাসন্নতার অঙ্গীকারে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। সেণ্ট অগাষ্টিন বা বুদ্ধের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সীমারেখা তাদের কাছে বড় ক্ষীণ, অস্পষ্ট।

যে জল জীবনের অন্য নাম, ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে তা হল মৃত্যুর দূত; তা পাপ ও মালিন্য থেকে এখানকার মানুষকে মুক্তির পথনির্দেশ করে না। এখানে শুধু পাথরের স্তূপ। ফিনিশীয় নাবিক ফ্লেবাস সারাজীবন লাভ-ক্ষতি, টানাটানি, ক্ষুদ্র অংশ ভাগ নিয়ে নিজেকে নিয়োজিত রেখেও সলিল সমাধিতে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়; শস্য এবং উর্বরাশক্তির দেবতা অসিরিসের মতো তার পুনর্জন্ম সম্ভব নয়। এটা পোড়াজমির দেশ। এখানে লাল ঝুলে-পড়া মুখগুলো

—৭

কেবল 'নাক ঝাড়ে' ও 'মুখ নাড়ে'। এখানে জীবন ও যৌবন হাসির মধুরতায় অনুপলব্ধ। এখানে হার্মিট থ্রাস এর গান নেই, আছে শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার ক্রন্দনের মতো একটানা স্বর। যুদ্ধপরবর্তী ইউরোপের প্রতিমূর্তির প্রতীকে যুদ্ধ পরবর্তীকালে নারীর ক্রন্দন ক্রুশবিদ্ধ যীশুর নিকটে মাতামেরীর ক্রন্দনের রূপকে আভাসিত। হয়তোবা এটি উর্বরাশক্তির দেবতা অসিরিসের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ নারীদের আর্তনাদের অনুকার।

বর্তমান সভ্যতার ঘেরাটোপের আড়ালে সভ্যতার পরম শত্রুদের (hooded hordes) দ্বারা সমস্ত মূল্যবোধ আজ আক্রান্ত; মানুষের ধর্মবিশ্বাস আজ পতনোন্মুখ গম্বুজের (falling towers) মতো; অসংখ্য খালি চৌবাচ্চা (empty cixterns) ও ফুরিয়ে-যাওয়া কূপ (exhausted wells)-এর প্রতীকে গীর্জার অন্তঃসারশূন্য অস্তিত্ব পরম আড়ম্বর সহকারে অবিরাম ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা সূচিত। আপন অহংকারে গণ্ডীবদ্ধ জীবনে পরম অভ্যস্ততার প্রতিশ্রুতিতে আমরা সবাই রোমক বীর কোরিওলেনাস-এর সহযোগী। আমরা সবাই ঘোড়-সওয়ারের আসনে রশি ধরে বসে আছি, নিয়ন্ত্রণের অধিকার বা ক্ষমতা আমাদের নেই। পচা-গলা সভ্যতার ভারে একদা লণ্ডনবাসীর গর্বের বস্তু লণ্ডন ব্রিজ আজ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে।

যুদ্ধোত্তর যুগের এই নিঃসঙ্গতা, হতাশা, বীতস্পৃহা, জীবন্মৃত অবস্থা আদিম বর্বরতার প্রতীকী হয়ে আমাদের চারিদিক ঘিরে রয়েছে। শুধু দিনযাপনের অর্থহীন গ্লানি নিয়ে পরম নির্দ্বিধায় ধীবরের মতো আমরা বিপদসংকুল গভীর সমুদ্রের দিকে—অন্ধকার, আরো অন্ধকারের অভিমুখে পাড়ি জমিয়েছি; অনুভূতির তীব্রতা হারিয়ে অতীতের স্মৃতির সুরভিতে আমোদিত না হয়ে শুধুমাত্র আসক্তির আগুন জ্বালিয়ে এ যুগের মানুষ 'আলো, আরও আলোর' দিকে এগিয়ে যেতে পারেনি। এলিয়ট বিশ্বাস করতেন, কালের বন্ধনকে সাধনা ও প্রচেষ্টা দিয়ে অতিক্রম করতে হয় 'Only through time, time is Conquered'. অন্ধকারের মধ্যেই আলোর নিশানা খুঁজে পেতে হয়। কবির জিজ্ঞাসা—'Will the sunflower turn to us ?' 'বার্ণট নর্টন'-এ চারিদিকের নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে পবিত্রতার ছোঁয়া অনুপস্থিত থাকলেও তিনি বুঝেছিলেন—

"But the abstract conception
Of prirvate experience at its greatest intensity,
Becoming universal, which we call 'poetry'
May be affirmed in verse".

এলিয়ট চাইলেন—মানুষের 'Word' নয়, ঈশ্বরের 'Logos'—মহাকালের ধ্বনিতে সীমিতকালের ঊর্ধ্বচেতনায় বাক্-প্রজ্ঞা, শব্দ-জ্ঞান ও পার্থিব অজ্ঞতার মেলবন্ধন চাই। মধ্যযুগের 'Roman de la Rose' এর ফসল হিসেবে বর্তমানের

শিশুরা কামজ না হয়ে হৃদয়ের উত্তাপের প্রতিফলণ হিসেবে চিহ্নিত হোক। যীশুখ্রীষ্টীয় পাপবোধের উত্তরাধিকার, ম্যাকবেথের পাপ-চিন্তার প্রতীকে ডাইনী-কুল, হ্যারির জীবনে একটি কালো রাত্রির বিভীষিকা পরম সজ্ঞানে ও সচেতনতায় বিবেকের দংশনে পরিশুদ্ধি লাভ করুক। যুদ্ধোত্তর যুগে ইউরোপের এই জড়, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গসত্তা আর্তনাদের কোয়াসে মুক্তির সম্ভাবনায় 'পারিবারিক পুনর্মিলন' (The Family Reunion)-এর উপযুক্ত বনিয়াদ গড়ে তুলুক; বর্তমানের কেন্দ্রবিন্দুতে শুরু হোক ভবিষ্যত এবং অতীত থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা —'liberation from the future as well as the past.' ১৯২০ সালের লণ্ডন, বদলেয়ারের প্যারিস, সেন্ট অগাষ্টিনের কার্থেজ একই সূত্রে বিধৃত; ক্লিওপেট্রা, রাণী এলিজাবেথ, আধুনিক টাইপিস্ট রমণী, টেমস নদীর তীরে দরিদ্র দেহপোজীবিনী—সকলেই তো চিরন্তনতার সূত্রে আবদ্ধ। জীবনেতিহাসের আবর্তনে ইতিহাসের চক্র এককভাবে ছন্দ হারিয়ে ফেললেও অক্ষয় মহাকাল ('still point') যীশুর জীবনের পর্ব সমূহের বা উপনিষদের 'দত্ত, দয়ধ্বম্, দাম্যত'-এর অম্বিতরূপে শাশ্বত বর্তমান ('Eternal Now') রচনা করতে বাধ্য। যুগ-যুগান্তের কবি টি. এস. এলিয়ট তাঁর গভীর মনন-সঞ্জাত প্রজ্ঞা ও অনুভূতির সার্থক প্রয়োগে জড়ত্ব, হতাশা ও নিঃসঙ্গতার এই জঙ্গম রাজত্বেও উপলব্ধি করেছেন মহাকালের ইংগিত:

'Remember, living in time,
You must live also now in Eternity'.

কালের কবি এলিয়ট

সমীরণ মজুমদার

১৯৩০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর কবিদের উপর যাঁর প্রভাব দুরন্তভাবে সমাচ্ছন্ন ছিলো, তিনি হলেন ইংল্যাণ্ডের নাগরিক, কবি টমাস স্টার্নস এলিয়ট; যদিও তাঁর খ্যাতি বা সাহিত্যিক-চর্চা নিবদ্ধ ছিল না শুধুমাত্র কবিতার মধ্যে। জীবনের প্রথম তিরিশ বছর অবধি দর্শন-চর্চা করেছেন। অক্সফোর্ডে গ্রীক দর্শন পড়েছেন, ব্রাডলের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন, 'International journal of Eathics' পত্রিকায় দর্শনের উপর বহু মূল্যবান আলোচনা করেছেন। কাজেই তিনি যেমন একজন শক্তিশালী কবি ছিলেন, তেমনি একজন বড় সমালোচক এবং দার্শনিকও ছিলেন। কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁকে কোলরিজ, ড্রাইডেন, বা আর্ণল্ডের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসানো যায়। চিন্তার গভীরতায়, বক্তব্যের মৌলিক ভঙ্গিতে তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন এক ধারার প্রবর্তন করেছেন। 'The Monist' পত্রিকায় লিবনিৎজের (Gottfried Wilhelm Leibniz) ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন। ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের প্রতি অনুরাগ, মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস, Obscure Cult সম্বন্ধে আগ্রহ, পরিশীলিত আন্তর্জাতিক চৈতন্যের প্রতি আস্থা এবং জীবন ও জগৎ বিষয়ে স্বচ্ছ দার্শনিক বোধ তাঁর কবিতাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেছে. সমকালীন এবং পরবর্তী যুগের কবিদের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছে। বায়রণ বা স্কটের মত তিনি জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠেননি ঠিকই কিন্তু তিনি ছিলেন কবিদের কবি।

এলিয়ট কাব্যচর্চার প্রথমভাগে এজরা পাউণ্ড এবং জুল লাফার্গের কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই দুই জন কবির প্রভাব তাঁর কবিতায় যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে এলিয়ট জর্জ-স্যান্টায়ানার দর্শনে মুগ্ধ হন, দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' পাঠ তাঁর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর সাহিত্যে, কাব্যে, নাটকে, জীবন দর্শনে দান্তে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। অধ্যাপক আর্ভিং ব্যাবিটের কাছে ক্ল্যাসিসিজম্ বা ধ্রুব-সাহিত্য এবং ট্র্যাডিশন বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ধারণার জন্য এলিয়ট শিক্ষা গ্রহণ করেন; তাই ব্যাবিটের কাছে তিনি অশেষ ঋণী। কবিতা চর্চার প্রারম্ভে টেনিসন, সুইন্‌বার্ণ, আর্ণেষ্ট ডসন ও সাইমনস্ প্রমুখ কবিদের কবিতায় মুগ্ধ হন এবং তাঁর প্রথমদিকের কাব্যচর্চায় এঁদের কবিতার ছায়াপ্রবেশ ঘটে। সাইমনসের 'দি সিম্বলিষ্ট মুভমেন্ট ইন লিটারেচার'

এলিয়টের হাতে আসতে কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়। লাফ্যর্গ, কর্বি এর, র‍্যাঁবো এবং ভেরলেনের মতো কবি ও বিশিষ্ট সমালোচকদের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় হতে তাঁর কাব্যজগৎ সম্পর্কে ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটে এবং অনেক বেশি পরিণত হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা যা 'হার্ভার্ড অ্যাডভোকেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই ধারণা বা প্রভাব বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করেনি; তাঁর কাব্য-মানসে জন ডান, বোদলেয়র, দান্তের প্রভাব সে তুলনায় অনেক বেশি স্থায়িত্ব লাভ করে।

এলিয়টের নিজের স্বীকারোক্তিতে লিখছেন :

....the form in which I began to write in 1918 or 1919 was directly drawn from the study of Laforgue together with the later Elizabethan Drama.

এলিয়ট প্রথম দিকে এমনও মনে করতেন, এই জটিল এবং বিবিক্ত যুগের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যে ভাষা-মাধ্যম আমাদের প্রয়োজন হবে তা স্বাভাবিক কারণেই জটিল হতে বাধ্য, তা হবে 'Compressed and ironical.? কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এলিয়ট কাব্য-ভাষা সম্পর্কে বলছেন 'Language, in a healthy state....is so close to object that the two are identified'—অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি সিম্বলিস্ট ও ইমেজিস্টদের প্রভাব থেকে বিছিন্ন হয়ে অথবা দুটি প্রভাবকেই আত্মস্থ করে নিজের অম্বিষ্ট কাব্যজগতে প্রবেশ করেছেন। বন্ধু কনরাড আইকেনের মাধ্যমে এলিয়টের সঙ্গে পাউণ্ডের যে সাক্ষাৎ ঘটে পরবর্তীতে তা বন্ধুত্বের পর্যায়ে পরিণত হয়। এলিয়টের কবিতায় আমেরিকার অধিবাসী পাউণ্ড মুগ্ধ হন। সেই সময়ে লণ্ডনে এজরা পাউণ্ডের জয়-জয়াকার। পাউণ্ড আমেরিকার সাহিত্য-পত্রিকা Poetry-র সম্পাদিকা হ্যারিয়েট মনরোর কাছে এলিয়টের 'প্রুফ্রক' কবিতাটি পাঠান। এবং এরপর ১৯১৭ সালে 'দি লাভ্ সঙ অব্ জে, আলফ্রেড প্রুফ্রক অ্যাণ্ড আদার অব্জারভেশনস্‌, 'দি ইগোয়িস্ট' পত্রিকার আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। হারবার্ট রীড, ই. এম. ফরস্টার, ডোব্রি প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমালোচক সকলেই চমকে ওঠেন। 'এ যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি। লুই ম্যাক্‌নিস লিখলেন—"....I probably thought of Prufrock as verse libre and it was only unconsciously and insidiously that Eliot's extraordiary rhythmical skill rang its bell in my nerves. After a new readings I knew this poem by heart." পোয়েট্রি'র সম্পাদিকাকে এলিয়ট জানিয়েছিলেন "এই কবিতাই ('প্রুফ্রক') আমার এ পর্যন্ত রচিত কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" রবার্ট ব্রাউনিংয়ের ড্রামাটিক মনোলোগের মতোই এলিয়টের এ কবিতা। প্রুফ্রক কবিতায় দান্তের 'ইনফার্ণো থেকে একটা উদ্ধৃতি

ব্যবহৃত হয়েছে। গিডো দা ফন্টেফেল্ট্রাকে যখন প্রশ্ন করা হয়—সে কে ? তখন তার উত্তরে সে বলছে—

"যদি জানতেম যে, আমি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছি যে পৃথিবীতে ফিরে আসবে, তাহলে নরকের এই আগুনে আমি কাঁপতুম না। কিন্তু এই নরক থেকে কেউ ফেরে না। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি।"

একই উক্তি প্রুফ্রকেরও। প্রুফ্রকও গিডোর মত নিরপরাধী, আবার কোন সৎকাজও করেনি। এই নিষ্ক্রিয়তাই তার মুখ্য অপরাধ।

এলিয়ট 'প্রুফ্রকে' কোন বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করেননি, তাঁর খণ্ডিত সত্তার স্বগতোক্তি মাত্র। 'প্রুফ্রক' রচনা শুরু করেন ১৯১৭ সালে, যখন তিনি বাইশ বছরের যুবক। প্রযুক্তি আর প্রকরণের কথা বাদ দিলেও তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতা একজন যথার্থ শিল্পীর মতই : জন্মভূমি সেণ্টলুইসের আকাশ বাতাস বা ঝকঝকে শহুরে সভ্যতার দৈনন্দিনের ছক যার রূপকল্প এবং তির্যকতায় রীতিমত পরাক্রান্ত। একুশ বছরের অভিজ্ঞতাকে, দেশ-কাল ও ব্যক্তিত্বের বোধকে কবিতাটির মধ্যে একাকার করে দিয়েছেন। পারিবারিক গণ্ডির বাইরে নিসর্গের রূপসৌন্দর্য থেকে, স্বতঃস্ফূর্ত কৌতূহলের উৎসার থেকে যে অভিজ্ঞতার সঞ্চার, তার সঙ্গে আধুনিক বাস্তব জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেন। যে জীবনের অন্বেষণে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন অথচ যা তাঁর কাছে খুবই দুরূপনেয় হয়ে উঠেছিল—দৈনন্দিন ক্লিন্নতার মাঝখানেই, তাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অন্ধকার, অসুন্দরের ও অপ্রিয়ের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড়করাতে কুণ্ঠা করেননি। নিভৃত স্বভাবের কবি আত্মত্যাগ ও জনকল্যাণের মাধ্যমে ধর্মের রূপায়ণ আর শিক্ষার প্রসারকে জীবনের আদর্শ বলে স্থির করেছিলেন। হার্ভার্ডের বুদ্ধিদীপ্ত জলহাওয়ায় নিজেকে প্রশিক্ষিত করলেও রক্সবেরি-নর্থ কেমব্রিজের অসংস্কৃত জগৎ তাকে খুব বেশি আক্রান্ত করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গা টালি, টিন, ইটের টুকরো আর ছাইপাশ জঞ্জালে ভরা পোড়োজমিতে এসে তাঁর মন প্রশান্তিতে ভরে উঠেছিল। ১৯৩২ এ প্রকাশিত তাঁর দ্য ওয়েস্টল্যাণ্ড-এ এপ্রিল মাস নির্মম হলেও পোড়োজমিকে সাজিয়ে তোলেন লাইলাকে। আজন্ম শহুরে পরিবেশের মধ্যে এলিয়ট বড় হয়ে উঠেছিলেন ঠিকই তবু, গ্লসটারের ইস্টার্ণ পয়েন্টে নির্মিত তাঁদের বাড়ির চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, বুনোঝোপে কীর্ণ সমুদ্র তটরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত পাথরের চাঁই, কৈশোরে দেখা জানলার ওপারের পোতাশ্রয় থেকে মন্থর গতিতে প্রবহমান জাহাজের মাস্তুল, ইত্যাদির প্রভাবে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন, এই সব স্মৃতিচ্ছন্ন চিত্রকল্প তাই বারবার তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে : what seas what sores what grey rocks and what islands / What water laping the bow—(মেরিনা দ্য

কমপ্লিট পোয়েমস্ অ্যাণ্ড প্লেইজ অব টি. এস. এলিয়ট)।

তাঁর কবি স্বভাবের পিছনে গ্লস্টারের ধীবর সম্প্রদায়ের ভূমিকা উল্লেখ করার মত। ঝড়ের রাতে হারিয়ে যাওয়া জেলেরা ফিরে এসে তাকে গল্প শোনাত, এই জেলেদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও সৌহার্দ গড়ে উঠেছিলো। ফলে নিজেও একজন কুশলী নাবিক হয়ে উঠেছিলেন। তাই কবি যখনই তাঁর কাব্যে সমুদ্রকে এনেছেন তখনই এই সব জেলেদের স্থান দিয়েছেন শ্রদ্ধাচিত্ত হৃদয়ে। দ্য ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের চতুর্থ পর্বে ডেথ বাই ওঅটর-এ মৎস্য অভিযান এবং ভাসন্ত বরফখণ্ডের সংঘর্ষে নাবিকদের অনিবার্য পতনের বর্ণনা লক্ষনীয়।

'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' সম্পর্কে কবির নিজের বক্তব্য—"I wrote 'The Waste Land' to relive my own feelings", তবুও নির্দ্বিধায় বলা যায় শুধুমাত্র কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিই নয়, কাব্যটি আজকের সমাজেরই একটা বাস্তব চিত্র। দুর্বোধ্য হলেও বোঝা যায় কবিতাটির মূলে ফ্রয়েডের দর্শন গভীর ভাবে কাজ করেছে, যৌন অক্ষমতার কারণে মানুষের আধ্যাত্মিক অবক্ষয়, প্রাচীন অতীত থেকে এ যুগের সবই তিনি ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক যুগের যৌন বিকার, ব্যভিচার, পাপ ও সীমাহীন ঔদ্ধত্যই মানুষের আত্মশক্তি বিনাশের মূল কারণ। মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপের সভ্যতা, সংস্কৃতি মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা সবই ক্লিন্ন, মুমূর্ষু। আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে মানুষের কোন স্পৃহা বা বিশ্বাস নেই। তার বিশ্বাস মানুষ এসব থেকে মুক্তি পেতে পারে একমাত্র ধর্মসাধনা, প্রায়শ্চিত্ত ও অনুতাপের মধ্য দিয়ে, তবেই সে তার মনুষ্য ধর্মে ফিরে আসতে পারে। দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড বুঝতে হলে আমাদের জানতে হয়, ইতিহাস. সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্র সব কিছুই। কবিতাটি অসংখ্য চিত্রকল্প, প্রতীকি বিন্যাস ও নাটকীয়তায় পূর্ণ; হতাশা, নৈরাশ্যের মধ্যেও মানুষের শাশ্বত বেঁচে থাকার কথাই বারবার প্রতিধ্বনিত। যে পদ্ধতিতে জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চান কবি, তা হ'ল ক্ল্যাসিসিজম্ ও ট্রাডিশন্। জীবনবোধের পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলনই তিনি তাঁর সাহিত্যে, কাব্যে এ ভাবেই গড়ে তুলেছেন।

'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কবিতায় কবি পরোক্ষে বুদ্ধের বাণীই প্রচার করেছেন। সেই কামনার আগুনে সমাজের সর্বস্তরের দহন লক্ষ্য করেছেন। তিন দরিদ্র তরুণী সেই ধ্বংসের বাণী শোনালেও, সেই অবক্ষয়ের গান গাইলেও কাব্যের চতুর্থ অংশে Death by water এ তিনি বলছেন "Ganga was sunken and the limp leaves./Waited for rain". আসন্ন বর্ষণের আভাসে, ঊষর ধরণীতে বৃষ্টির অজস্র ধারায় আশার বাণী শোনান। সেই বর্ষণে সকল কলুষতা, সকল মলিনতা ধুয়ে পোড়োজমি সুজলা-শ্যামলা হয়ে উঠবে। শেষ খণ্ডে বিংশ শতাব্দীর মানুষকে হতাশার বলয় ভেঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ,

উপনিষদের শান্তির তপোবনে প্রবেশ পথের সন্ধান দিয়েছেন। সেই আশার বাণী, জীবনকে জানার রহস্য, বেঁচে থাকার স্বচ্ছ ঋজু পথ **Datta, Dayadhavam, Damayata/Shantih Shantih Shantih** তাঁর পোড়োজমিকে চিরায়ত করেছে।

দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের পর রচিত 'দ্য হলোমেন-'এ কবি আবার নৈরাশ্যে ফিরে আসেন। হলোমেনরা ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের অধিবাসী। তাদের জীবন শূন্যতায় পূর্ণ। আধ্যাত্মিকতার অর্থ তারা বোঝেনা। তারা ঈশ্বর বা শয়তান কারো কাছেই মাথা নত করে না। তারা মৃত্যু অভিলাষী, মানসিক মৃত্যুর জগতের বাসিন্দা, সেখান থেকে তারা মৃত্যুর অপর জগতে যেতে চায়। তারা জীবনকে যেমন ভয় পায় আবার মৃত্যুকেও। নৌকোয় নরকের লেথি নদী পার হয়ে অন্ধ হলোমেনরা যাত্রা করবে অন্য এক অলৌকিক জগতের উদ্দেশ্যে, অথচ তারা মত্যুর সময় মত্যুর মুখোমুখি হতে ভয় পায়। তারা আশাহীন, বিশ্বাসহীন কালো ছায়ার দেশের বাসিন্দা। ছায়া তাদের বাসনা। সেই কালো ছায়ার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তারা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না। মৃত্যুর অপর রাজ্যে পৌছানোর তীব্র আকুতি থেকেই তারা বুঝতে পারে তারা ক্লান্ত বিমর্ষ, স্থবির। পৃথিবীর ধ্বংস-ধ্বনি তারা আর শুনতে পাবে না, ঘ্যান ঘ্যান করেই তাদের বিদায় নিতে হবে। তাদের না আছে সৌন্দর্যবোধ, না আছে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা বা মত্যুর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। পাপ-পূন্য, শুভ-অশুভ, কুৎসিত-সুন্দর কোন বোধই তাদের নেই। তাদের দেবতা নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তি। তাদের আশাও নেই, ভরসাও নেই। তারা সকলেই ছায়ায় আবৃত, ফলে বিচ্ছিন্ন, এ যেন পোড়োজমির মাঠে দণ্ডায়মান কাকতাড়ুয়া। জ্ঞান, বুদ্ধি, বোধহীন সব না মানুষই হ'ল হলোমেন-এর অধিবাসী। এ কবিতায় দান্তের প্রভাব খুব স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়। দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের 'unreal' সহর কল্পনার সময় দান্তের 'Limbo'র কথা মনে করেছিলেন, তেমনি দ্য হলোমেনের ক্ষেত্রে দান্তের 'ইনফার্ণোর' সুর আমরা শুনতে পাই।

এলিয়টের কবিতা সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ডে বিশ্বের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি একাধারে কম্যুনিজম ও ফ্যাসিজম এর বিরোধিতা করেছেন। ধর্মবিরোধী কোন নীতিতেই তার বিশ্বাস ছিলনা। এলিয়ট বলেছিলেন, তিনি ধর্মে অ্যাংলো ক্যাথলিক, সাহিত্যে ক্লাসিসিস্ট, রাজনীতিতে রাজ-ভক্ত। নীতি, ধর্ম ও রাজনীতির সঙ্গে কবিতার নিগূঢ় সম্পর্কের কথা এলিয়ট মানতেন। তিনি শেকসপীয়রের কবিতার চেয়ে দান্তের কবিতা বেশী পছন্দ করতেন। দান্তের কবিতায় যে জীবন রহস্য সম্পর্কে তথ্য আছে তা তাকে বেশি আনন্দ দিত। এলিয়টের জীবনবোধ বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়েছে। 'অ্যাস ওয়েনেসডে' কবিতা দিয়ে (১৯৩০ থেকে)

এলিয়ট এক নতুন ভাবের সূচনা করেন। পূর্ববর্তী সময়ে লেখা কবিতার হতাশার পরিবর্তে পরীক্ষামূলক ধর্মবিশ্বাসের ভাব এখানে দেখতে পাই। 'ফোর কোয়ার্টেটস' চারটি পর্বে বিভক্ত। বার্ণট নর্টন, ইস্ট কোকার, ড্রাই স্যালভেজেজ ও লিটল গিডিং। গঠনের দিক থেকে কবিতার প্রত্যেকটি অংশ ক্লাসিক্যাল সিম্ফনি বা কোয়ার্টেটের সমতুল্য। চারটি খণ্ড কবিতা পড়লেই সেই গঠন নৈপুণ্য বোঝা যায়। ফোর কোয়ার্টেটস চারটি স্বতন্ত্র কবিতা নয়। এদের মধ্যে একই সুরের অনুরণন। বার্ণট নর্টন ১৯৩৬-এ, ইস্ট-কোকার ১৯৪০-এ, ড্রাই স্যালভেজেজ ১৯৪১ এবং লিটল গিডিং ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। ফোর কোয়ার্টেটস এর নায়ক কাল। অ্যাশ ওয়েনেসডে থেকে এলিয়টের কবিতা একটা বড় বাঁক নিয়েছিল। ধর্মবিশ্বাসেই তিনি জীবনের আস্থা খুঁজে পেতে চান, এবং ফোর কোয়ার্টেটস থেকেই আধুনিকতার কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। কাব্যরচনায় এবং কাব্যপাঠে এলিয়ট বুদ্ধির গুরুত্বকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সুরের আচ্ছন্নতায় আত্মসমর্পণ না করে বুদ্ধিকে টান টান রেখে কবিতার রসাস্বাদনের চেষ্টা পাঠককে বেশি দায়িত্বশীল করে তোলে। ফোর কোয়ার্টেটস-এ এলিয়ট মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের আলোচনা করেছেন। এখানে কবি একটি প্রতীককে একাধিকবার ব্যবহার করেছেন—"The still point of the turning world." এই কাল যা অজর, অমর—তিনিই পরমাত্মা। Turning world ক্ষণস্থায়ী। ভারতীয় শাস্ত্রে এই ঘূর্ণায়মান কালের রথচক্রের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মের স্বরূপ সীমিত সময় এবং চিরন্তন সময় উভয়ের মধ্যেই বিধৃত। ফোর কোয়ার্টেটস্ এ এলিয়ট বলছেন 'Eternal Now.'

'If all time is eternally present' অথবা And all is always now এই আপাত বিরোধী ভাবটি বার্ণট নর্টন-এ প্রকাশ করেন। 'The Rock' কাব্য নাট্যেও একই ভাব ফুটে উঠেছে। 'ইস্ট কোকার', রচনা করেন বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায়। প্রথম পর্বে অতীতের কাহিনী। দ্বিতীয় পর্বে বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতি। তৃতীয় পর্বে ভবিষ্যতের দিকে তাকানো, নৈরাশ্যের মধ্যে আশার আকিঞ্চন। চতুর্থ পর্বে মানুষের অসুস্থতার কথা। যীশু হলেন শল্য চিকিৎসক। পৃথিবী হল হাসপাতাল। যীশু আছেন তাই ভরসা।

ইষ্টকোকার এলিয়টের পূর্বপুরুষের গ্রাম। সপ্তদশ শতকে তারা ইংল্যাণ্ডের এই গ্রাম থেকে আমেরিকায় চলে আসেন এবং নতুন 'begining' এর সূত্রপাত করেন। এলিয়ট তিনশ বছর পর ১৯৩৭ এ ইষ্টকোকারে প্রত্যাবর্তন করে 'end' বা সমাপ্তির বার্তা ঘোষণা করেন। যীশুর জীবনের চারটি পর্ব—ক্রুশ বিদ্ধ হওয়া, মৃত্যু, সমাধি এবং পুনরুত্থান। মানুষের জীবনেও চারটি পর্ব। পঞ্চম পর্বে কবির বক্তব্য—আমরা প্রতি মুহূর্তে যা হারাচ্ছি তাই খুঁজে বেড়াই। ইতিহাসের চক্র তার ছন্দ হারিয়ে ফেলছে, wisdom of age মানুষের কাছে

সুদূর পরাহত। "But perhaps neither gain nor loss / For us, there is only the trying. / The rest is not our business."ফলের আশা না করে কর্মের প্রতি অনুগত হতে বলেছেন। গীতায় বর্ণিত নিষ্কাম কর্মের সাহায্যেই কালের উর্ধ্বে যাওয়া সম্ভব।

'দ্য ড্রাই স্যালভেজেজ' এলিয়টের বাল্যের সুখস্মৃতি। প্রথম পর্বে জীবনকে নদী ও সমুদ্রের তুল্য বলে মনে করেন। এ নদী 'strong drown god' যা আদিম বর্বরতার প্রতীক। ক্রুদ্ধ, উদ্দাম, বন্ধনহীন (sullen, intamed, intractable) নদীর মতোই মানুষের জীবন। সমুদ্র ও কালপ্রবাহ। নদীর থেকে যার পরিধি আরও বিশাল vast seas of time. মানুষের জীবন প্রবাহ ("The sea is all about us") সমুদ্রে গিয়ে মিশে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্বে জীবনের অসীম দুঃখের কাহিনীর মধ্যে যে অভিজ্ঞতার জন্ম তা যেন অর্থহীন। বহু মানুষের বহু প্রজন্মের নাম অতীত। "The past of others and the past of the race." তৃতীয় পর্বে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উবাচ অর্জুনের প্রতি বিধৃত। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে মানুষের জীবন। ভবিষ্যতের জন্য দুঃশ্চিন্তা না করে বর্তমানের কর্তব্যই একান্ত জরুরী। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করার অর্থ ফললাভের আশা না করে কর্ম করে যাওয়া, নিরাসক্ত জীবনলাভ করা। 'And do not think of the fruit of action. Fare forward.' যে কোন মুহূর্তেই মৃত্যু আসতে পারে। ঈশ্বরের কাছে মানুষের বর্তমান কর্মই বিবেচ্য।

চতুর্থ পর্বে কুমারী মেরীর কাছে এলিয়ট প্রণাম করছেন। এলিয়ট বলেন কালের সাহায্যেই কালকে জয় করা সম্ভব। কালকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ভাগ করার অর্থ মানুষের অখণ্ড সত্তা ও ব্যক্তিত্বকে দ্বিখণ্ডিত করা।

"Not farewell,
But fare forward, voyagus."

কবি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয় সাধন করে বলেন সংসারের অলাতচক্র থেকে মুক্তির কথা।

পঞ্চম পর্বে ভবিষ্যতের দায় দায়িত্ব ঈশ্বরের কাছে সমর্পন করাই শ্রেয় বলে মনে করেন। মহাপুরুষ মানব কল্যাণের স্বপ্নে বিভোর। তিনি মৃত্যুকে ভয় পাননা। তাই তাঁর জীবন এতো আলোকজ্জ্বল। সৎকর্ম মানুষকে অতীত ও ভবিষ্যত থেকে মুক্তি দিতে পারে।

লিটল গিডিং ইংল্যাণ্ডের এমন একটি গ্রাম যেখানে ইতিহাস বারে বারে রচিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকে এই গ্রামের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এইখানে অ্যাংলিকান চার্চের প্রতিষ্ঠা। এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনেকেই এলিয়টকে প্রভাবিত করেছেন। ন্যাসবির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা প্রথম চার্লস এখানকার গির্জায় মনের আকুতি জানাতে এসেছিলেন। প্রথম পর্বে—

you are here to kneel.
Where prayer has been valid.

একটি নমস্কারে সমস্ত হৃদয় লুটিয়ে পড়ছে ঈশ্বরের চরণে। দ্বিতীয় পর্ব অবক্ষয় ধ্বংস ও মৃত্যুর পটভূমিতে রচিত। বাতাস, মাটি, আগুন ও জলের মৃত্যু-কাহিনী। মানুষের আত্মার মৃত্যুকেই বিভিন্ন প্রতীকি ব্যাঞ্জনায় বাতাস, মাটি, জল ও আগুনের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। তৃতীয় পর্বে আশার বাণী প্রচার করেন। নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি আসক্তি, অনাসক্তি আর বীতস্পৃহা এই তিনটি অবস্থার ব্যাখ্যা করেছেন। চতুর্থ পর্বে স্বর্গীয় প্রেমের ব্যাখ্যা। পাপের হাত থেকে মুক্তির জন্য ভালোবাসার একান্ত প্রয়োজন। সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্তির জন্য ভালোবাসা অপরিহার্য। ভালোবাসা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা। Love was his meaning. পঞ্চম পর্বে We are born with the dead. মৃত্যুর অর্থ ই হল নবজন্ম। শুরু আর সারা সমান।

অ্যাশ্ ওয়েনেসডে কবিতাটি ছটি পর্বে বিভক্ত। অ্যাংলিকান চার্চে প্রবেশের পর থেকেই তিনি প্রত্যয়ের দৃঢ়ভূমিতে অবস্থিত। তাঁর সেই ধর্ম-জীবনের রূপান্তর এখানে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। অতীত ও ভবিষ্যতের দ্বন্দ্বের কথাই প্রথম পর্বে বিধৃত। খৃষ্টধর্ম গ্রহনের পূর্বাবস্থা হল অতীত এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পরবর্তী অবস্থা হল ভবিষ্যত। ভার্জিন মেরীর কাছে প্রার্থনা করছেন—"Pray for us sinners now and at the hour of our death." দ্বিতীয় পর্বে অতীত জীবনের অবসান ঘটিয়ে নবজন্ম লাভের জন্য লেডির উদ্দেশ্য আকুতি জানাচ্ছেন। লেডির সঙ্গে তিনটি চিতাবাঘ। তারা পবিত্রতার প্রতীক। তারা তার পা, হৃদয়, যকৃত এবং মস্তিষ্ক খেয়ে ফেলল। অর্থাৎ শারীরিক শক্তি, আবেগ, কাম ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাসনার অবলুপ্তির অর্থ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ; তৃতীয় পর্বে বহু মানসিক যন্ত্রণা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, খাড়া সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করে—কামনার বিসর্জন দিয়ে নবজন্মের দীক্ষা গ্রহণ। চতুর্থ পর্বে ভায়োলেট ফুলের সমারোহের মধ্য দিয়ে লেডি তাঁকে দ্রুতবেগে নিয়ে যাচ্ছেন। ভায়োলেটের সমারোহের মাধ্যমে কবি জীবনের কাছে মত্যুর পরাজয়কেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। পঞ্চম অংশে যীশুর কথা। যীশু হলেন আদি পিতা। যার ক্ষয় নেই। মানুষ কামনা বাসনায় এমনই মোহান্ধ যে তার আর ঈশ্বরের বাণীর প্রতি উৎসাহ নেই। ষষ্ঠ অংশে কবি কুমারী মেরির কাছে কামনা বাসনা থেকে মুক্তির জন্য আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন। "our peace is His will." লেণ্ট উৎসব উপলক্ষে এলিয়ট এই কবিতাটি রচনা করেন। ধর্মের প্রতি আনুগত্যই কবিতাটির মূল উৎস। লেণ্ট উৎসব প্রকৃতই বেদনার। যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন মানুষের কল্যাণের জন্য। এই কারণেই মানুষের এতো বেদনা। ইষ্টারে যীশুর পুনরুত্থান। লেণ্ট

উৎসবের সময় খৃষ্টানেরা সবরকম কৃচ্ছ্রসাধন করে থাকেন। এলিয়টের ধর্মজীবন ও বিশ্বাসে ঝলসিত এক মুহূর্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে এখানে।

'জার্নি অব দ্য ম্যাজাই', 'অ্যানিমিউলা', 'এ সঙ ফর সিমিয়ন' এবং 'ম্যারিনা'—এলিয়টের গভীর ধর্ম বিশ্বাসেরই স্পষ্ট স্বীকৃতি। এলিয়টের বিশ্বাস ছিল ধর্ম ব্যতীত কোন পথ নেই। তিনি খৃষ্টধর্মের মধ্যে, উপনিষদের বাণীর মধ্যে আলোর নিশানা খুঁজে পান। জনমতকে উপেক্ষা করতে পারেন না। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বৃটেনের চার্চই একমাত্র আলোকবর্তিকা। তিনি ক্লাসিকাল অনুশাসনে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই শৃঙ্খলা ও বিধি ব্যবস্থাকে তিনি মেনে চলেন। তাঁর কবিতা ও নাটক সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। দ্য ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড, দ্য হলো মেন, জেরন্টিয়ন প্রভৃতি কবিতায় মানুষের জীবনের বিকৃতি ও ব্যভিচার পর্যবেক্ষণ করেছেন। অন্তর দিয়ে তিনি শান্তিবাদী। মুসোলিনের অত্যাচারে তিনি ক্ষুব্ধ। কম্যুনিজম্ ও ফ্যাসিজম্-এর স্বরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি অনুপ্রেরণায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে Tradition ব্যতিরেকে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। অতীতকে আঁকড়ে ধরে স্বপ্নাবিষ্ট হওয়ার নাম Tradition নয়। সচেতনভাবে অতীতকে জানতে হবে। সেই জানার জন্য প্রয়োজন ঐতিহাসিক বোধ। সমাজের মানুষের আশা, ভরসা, সুখ, দুঃখ, অভ্যাস, রীতিনীতি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান সবই Tradition এর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু তিনি অ্যাংলো ক্যাথলিক তাই ঐতিহ্যকে তিনি দেবতার আসনে বসান। ঐতিহ্যবোধসম্পন্ন লেখক বিশ্বাস করেন, সাহিত্য নিরবিচ্ছিন্ন। ঐতিহ্যের কষ্টিপাথরে যে কোন লেখকের মূল্যায়ন করা উচিত। এলিয়টের দান্তে-প্রীতি ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি আনুগত্যের কারণে।

প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি এলিয়ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কাব্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এশিয় কবিতার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—"The artistic" sensibility is impoverished by its divorce from the religious sensibility, the religious by its separation from the artistic. ভারতীয় দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের কাছে তাঁর ঋণ অকপটে স্বীকার করেছেন। ঐতিহ্যের কাছে, পূর্বসূরীদের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকারের মাধ্যমে বোঝাতে চান যে কবিতার ক্ষেত্রে মৌলিক তত্ত্ব বা সত্তা বলে কিছু থাকতে পারেনা। "in poetry there is no such thing as complete originility, owing nothing to the past. Whcnever a virgil, a Dante a Shakespeare, a Gouthe is born, the whole future of European Poetry is altered." সমস্ত অন্ধকার, অশুভ শক্তিকে দূর করে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলা একজন কবি বা দার্শনিকের পক্ষে সম্ভব নয়। যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার মানুষ একাজ করছেন। তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসেই একদিন আলোকজ্জ্বল পৃথিবী রচনা সম্ভব।

মন্তাজে এলিঅট

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

লেখকের কথা

বিশ শতকের অপরাহ্ণে এসে নতুন ক'রে আর বলবার প্রয়োজন নেই যে, টি. এস. এলিঅট একজন বড়ো মাপের কবি, কাব্যসমালোচক এবং চিন্তাবিদ : বিদেশী এবং দেশী বহু প্রাজ্ঞ প্রাবন্ধিকেরা তাঁদের শ্রমপ্রসূত এবং বিশ্লেষণধর্মী রচনার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন শিল্পের পৃথিবীতে এলিঅটের অনতিক্রম্য উৎকর্ষ এবং কৃতিত্ব। সম্ভবত, ইংরেজি সাহিত্যে শেকসপীয়রের পর একমাত্র এলিঅটকে নিয়েই এ-পর্যন্ত রেকর্ড-সংখ্যক সমালোচনা পুস্তক প্রকাশিত হ'য়েছে। সেই বহু চর্চিত প্রসঙ্গগুলো পুনরায় উত্থাপন করা বা পাঠকের গোচরে আনা এই রচনার উদ্দেশ্য নয়। এলিঅটের সমসাময়িক বহু বিশ্বখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক বা বুদ্ধিজীবীদের কাছে কি'ভাবে ধরা পড়েছিল এই কবির প্রতিভা ; কতদূরইবা তিনি গৃহীত বা বর্জ্জিত হ'য়েছিলেন এঁদের কাছে, তারই একটা ধারনা তৈরী করার প্রয়াস লক্ষিত হ'তে পারে এখানে : একজন কবি বা লেখক যখন বিখ্যাত হ'য়ে ওঠেন তখন তাঁর খ্যাতির চোখ ঝলসানো রশ্মিই আমাদের নজরে আসে স্বভাবত। কিন্তু এই হ'য়ে ওঠার পেছনে লুকিয়ে থাকে যে নিঃশব্দ যুদ্ধ ; কিংবা চলতি মূল্যবোধ, বা শৈল্পিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ভঙ্গীতে, নতুন আঙ্গিকে দেখতে চাওয়া মূল্যবোধ এবং শৈল্পিক মানের ভাগ্যে ঘটে যে আপাত প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধ তার খোঁজ কজনই বা রাখতে চায় ?

এতো আমাদের সকলেরই জানা যে, প্রতিভাবান লেখক মাত্রেই সন্ধান করেন নতুন পথ। পূর্বসূরীরা যে গতানুগতিক পথ ধরে একদিন হেঁটে গেছেন, সেই কাদা-হ'য়ে-যাওয়া পথ সচেতনভাবে এড়িয়ে তাঁরা হাঁটতে চান অজানা, দুরূহ পথে। জর্জিয়ান এবং ভিক্টোরিয়ান কবিদের কল্পনা নির্ভর, আবেগ-আশ্রিত প্রেমের কবিতা আর প্রকৃতি-বন্দনা পাঠ করে ইংরেজী পাঠকদের যখন নাভিশ্বাস উঠছে ঠিক সেই কালবেলায় নতুন আঙ্গিক নিয়ে, নতুন স্বর নিয়ে এবং নতুন শব্দ সচেতনতা নিয়ে কবিতার আসরে এলেন পাউণ্ড এবং এলিঅট। অবিলম্বে প্রমানিত হ'ল এঁদের উদ্ভাবনী প্রতিভার চমৎকারিত্ব। প্রথমজন হয়তো কবিদের শিক্ষক হিসেবেই আলোচিত হলেন বেশী। কিন্তু এলিঅটের অবদান পাউণ্ডের থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ। যে কবিতা এতকাল বিচ্ছিন্ন ছিল জীবন থেকে, সেই কবিতাকেই আবার তিনি যুক্ত করলেন জীবনের সঙ্গে। বিশ্বযুদ্ধ-জর্জরিত, সমস্যাক্লিন্ন

আর যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষেরা তাদের হাহাকার এবং আর্তনাদকে মূর্ত হ'তে দেখল এলিঅটের কবিতায়। 'Like a patient etherised upon a table, ...with this line modern poetry begins',—এই কথা আমাদের জানালেন স্বনামধন্য মার্কিন কবি জন বেরিম্যান। কিন্তু সমসাময়িক সমস্ত লেখকের কাছ থেকেই কি এলিঅট পেয়েছিলেন উচ্ছ্বসিত অভিবাদন? তাঁর অসাধারণ প্রতিভা সম্বন্ধে এদের কারো কারো মনে ছিল না কি কোনোরকম সন্দেহ এবং সংশয়? সেরকম যদি না হবে তাহ'লে কেনইবা ১৯৩৪ সালে লিও স্টিন নামে এক দিকপাল কাব্যরসিক এলিঅটের কবিতা-বইয়ের প্রসঙ্গে তাচ্ছিল্য করে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'I entertain grave doubts whether the book of, T. S. Eliot's was worth the freight charges. এটাও জানতে হ'য়েছে আমাদের যে, ১৯৩০ সালে এক কট্টর কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবী এলিঅটের সদ্যপ্রকাশিত কবিতা-বই অবহেলায় টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘোষনা করেছিলেন যে, এই ধরণের trash জিনিষের জায়গা তাঁর বাড়িতে কখনোই হবে না। ওয়ালেস স্টিভেনসের মতো নামী কবিও মন্তব্য করেছিলেন এলিঅট সম্বন্ধে—'...I regard him as a negative rather than a positive force'.

এলিঅটের জন্মের পর একশ বছরের মাথায় আমাদের কাছে খুবই মজার আর বিচিত্র মনে হ'তে পারে এই কবি সম্বন্ধে বিখ্যাত ব্যক্তিদের এইধরনের বিরূপ মন্তব্যগুলো। কিন্তু এরকম অবিচার বোধহয় লেখকদের ক্ষেত্রে সব যুগেই হ'য়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথকে যেমন তাঁর প্রথম ঝলকানিতে খোলামনে গ্রহণ করতে পারেননি তাঁর সমসাময়িকেরা, সেরকমই আবার রবীন্দ্রনাথ নিজেও বুঝতে ভুল করেছিলেন জীবনানন্দকে কিংবা সজনীকান্ত দাশেরা ক্রোধে বর্জন করেছিলেন কল্লোলযুগীয় আধুনিকতাকে। যদিও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অনুবাদ করেছিলেন এলিঅটের কবিতা; কিন্তু তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে গদ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি ঠোঁটে একটা তির্যক ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে তিনি পড়েছিলেন এলিঅটের মতো আধুনিকদের কবিতা। 'The Waste Land' পড়ার পর ১৯২২ সালে কবি হার্ট ক্রেন মন্তব্য করেছিলেন—'It was good, of course, but so damned dead.' আর ঐ একই কবিতা পড়ে ভার্জিনিয়া উলফের অভিজ্ঞতা দাঁড়ালো এরকম —'I have only the sound of it in my ears....and have not yet, tackled the sense. But I like the sound.' এলিঅটেরই সমসাময়িক কয়েকজন উল্লেখযোগ্য এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, কবি এবং গদ্যকারের ব্যক্তিগত চিঠি, মেমোয়ার্স কিংবা প্রবন্ধের অংশবিশেষ অনুবাদের মাধ্যমে হাজির করা হ'ল পাঠকের সামনে। এখানে ইয়েটসের মতো বয়োজ্যেষ্ঠ কবিকেও দেখা যাবে এলিঅটের কবিতার জটিল আঙ্গিককে কিছুটা স্বীকৃতি

দিতে। আবার দিলান টমাসের মতো ছটফটে, তরুণ কবিকেও দেখব তাঁর প্রধান পূর্বসূরী সম্পর্কে অতি নিন্দাসূচক মন্তব্য করতে। একদিকে প্রশংসা এবং প্রশস্তি আর অন্যদিকে নিন্দা কিংবা তাচ্ছিল্যের টানাপোড়েনে এলিঅট-বিষয়ক এই মন্তাজ আকর্ষনীয় হ'য়ে উঠবে আশা করা যায়।

১৯১৭

কবি টি. এস. এলিঅটকে আমার সঙ্গে খাবার নিমন্ত্রণ করেছি। ⋯লোকটি চমৎকার।

আলডাস হাক্সলে

১৯১৮

গত সপ্তাহে লণ্ডনে এলিঅটের সঙ্গে দেখা। বেশ উপভোগ্য সাহিত্যের আলোচনা করা গেল ওর সঙ্গে। Little Review পত্রিকায় ওর তিনটি কি চারটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে,—দুটো কবিতা বেশ মজার, অন্যগুলো তেমন নয়। ভদ্রলোক বেশ উল্লেখযোগ্য। এবং মনোহরও।

আলডাস হাক্সলে

১৯১৯

টি. এস. এলিঅট, মঁপাসা এবং The little Review পত্রিকা—আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

হার্ট ক্রেন

১৯২০

এলিঅটের প্রভাব নব্য ইংরেজদের ওপর কর্তৃত্ব করবে।

হার্ট ক্রেন

একজন এলিঅটের সামনে আমরা জীবন্ত বা প্রখর হ'য়ে উঠি ঠিক যেমন একজন সেজানের সামনে আমরা জীবন্ত বা প্রখর হ'য়ে উঠি।

ই. ই. কামিংস

১৯২১

যখনই এলিঅট পড়ছি আমি চমকে উঠছি। দেখছি আমার ভাবনায় কতটা ভুল; আর এলিঅট কতটা ঠিক।...

ভার্জিনিয়া উলফ

১৯২২

এলিঅটের The Waste Land সম্বন্ধে তোমার ধারনা কিরকম? আমি তো হতাশ। লেখাটা অবশ্যই ভালো, কিন্তু যেন কোনো প্রাণের স্পন্দন নেই। এলিঅট এতকাল যা কিছু লিখেছে সেসবের কাছে এই কবিতাটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

হার্ট ক্রেন

১৯২৩

আমার মতে এখনকার ইংরেজ লেখকদের মধ্যে পাঠকদের শ্রদ্ধা আদায় করার ক্ষমতা এলিঅটের মতো কারুর নেই। ···শ্লেষের তীক্ষ্ণতায় এই কবি বদলেয়ারকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

হার্ট ক্রেন

আমার মনে হয় একদিন দেখা যাবে, যদি সবকিছু ঠিকঠাক চলে, তরুণ লেখকেরা এলিঅটের দ্বারা ভীষনভাবে প্রভাবিত। এই প্রভাব জাতির সংস্কৃতির দিকটাকে আরও উন্নত করবে। সাধারণ মাপের লেখকদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়।

ভার্জিনিয়া উলফ

গতরাত্রে, উঁচু মহলের এক নৈশভোজে আমি অক্সফোর্ডের এক ছাত্রের পাশে বসেছিলাম। সে জানালো যে, তার প্রিয় কবি হচ্ছেন মিঃ এলিঅট। শুধু তার একার নয়, তার বন্ধুদেরও।···সে আরও বলল যে, এলিঅটের কবিতা তাকে অন্য কবিদের কবিতার থেকে অনেক বেশী আনন্দ দেয়। যদিও কবিতাগুলো তার বেশ কঠিন লাগে।

ভার্জিনিয়া উলফ

১৯২৬

যাবার রাস্তায় অক্সফোর্ডে আমরা থামলাম। একটা ওয়েস্টকোট আর কয়েকটা বই কিনলাম—সেগুলোর মধ্যে টি. এস. এলিঅটের কবিতাও ছিল। মনে হ'ল কবিতাগুলো দারুণ ভালো কিন্তু বোঝার পক্ষে বেশ কঠিন। বড়ো মাপের ভবিষ্যতদ্রষ্টাদের ভঙ্গীতে কথা বলেন ইনি।

এভিলিন উয়া

১৯২৯

যে কোনো বিষয়ই কবিতার বিষয় হ'তে পারে এটা ধরে নিয়ে নতুন রোমান্টিকদের দল (এদের নেতা টি. এস. এলিঅট এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জেমস জয়েস) তাদের কবিতায় আমাদের উপহার দেয়—একের পর এক কদর্য বর্ণনা, একরকম ভিজে, হতাশার আবহ আর নর্দমার প্রতি তাদের মোহ···।

দিলান টমাস

১৯৩২

শেষবারের মতো আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, নিশ্চিত এবং চূড়ান্ত-ভাবেই এলিঅটের (কবিতার) মৃত্যু হয়েছে ;—ওঁর সঙ্গে ওনার দলের অন্যরাও ফুরিয়ে গেছে।

উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস

১৯৩৫

টমাস ড্রিবার্গ নামে এক যুবকের অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ পড়লাম। মনে হ'ল, অনেক কবিতার মধ্যেই বেশ প্রতিশ্রুতি আছে; কয়েকটা তো ভালোই উতরেছে। কিন্তু ছেলেটির কবিতায় আগাগোড়া তোমার ভীষণ প্রভাব পড়েছে (আঙ্গিকের দিক দিয়ে হয়তো নয়, এ ব্যাপারে ওকে এখনও অনেক পরিশ্রম করতে হবে)। কিন্তু এখনকার কোন্ কবির ওপরই বা তোমার প্রভাব নেই?

[এলিঅটকে লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে] **এডিথ সিটওয়েল**

১৯৩৬

এলিঅট তার প্রজন্মের ওপর এক বিরাট প্রভাব ফেলতে পেরেছেন; কারণ তিনি সেইসব পুরুষ আর নারীদের বর্ণনা দিতে পারেন যারা বিছানা ত্যাগ করে এবং বিছানায় যায় কেবলমাত্র অভ্যাসের বশে; হৃদয়হীন এই জীবনকে বর্ণনা করার জন্যে তাঁর আছে যথাযথ প্রকরণ।

উইলিয়াম বাটলার ইএটস

যুদ্ধের তৃতীয় বছরে (১৯১৭) আমার জীবদ্দশায় দেখা সবথেকে বেশী বিপ্লব নিয়ে কবিতার জগতে হাজির হলেন একজন;—যদিও তাঁর বিপ্লব ছিল শুধুই প্রকরণগত; টি, এস, এলিঅট প্রকাশ করলেন তাঁর কবিতার বই। কোনো রোমান্টিক শব্দ, কিংবা ধ্বনি, স্মৃতিমেদুর কোনোকিছুই আর কবিতায় চলল না এরপর থেকে। কবিতার মধ্যে গদ্যের সাদৃশ্য চাই অবশ্যই, এবং গদ্যকার আর কবি দুজনকেই আমাদের সময়ের ভাষাকে বুঝতে হবে; বিশেষ কোনো বিষয় না হলেও চলবে ....। অতীত আমাদের প্রতারণা করেছে, এসো এই হতচ্ছাড়া বর্তমানকেই আমরা আঁকড়ে ধরি। আমরা যারা পুরোনো দলের তারা এই নতুন কবিতাকে অপছন্দ করেছিলাম। কিন্তু এর শ্লেষ এবং বিদ্রূপের তীব্রতাকে মেনে নিতেই হ'ল আমাদের।

ইএটস

১৯৪৭

....এলিঅটের কাছে জীবন মানে আনন্দ নয়। তাঁর কাছে আনন্দ সব সময়েই বক্রোক্তি মেশানো— যেন একটা চটকানো ফল, নরম শরীরে একটা ক্ষত। তাঁর মতে ভালো এবং মন্দের দ্বন্দ্বই, মানুষকে সজীব করে রাখে....। তাঁর মতো কবির দৃষ্টান্ত দুর্লভ, তিনি অনুভব করেন, ভাবতে পারেন, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন এবং নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁর আছে এক সুশৃঙ্খল, প্রায় অতীন্দ্রিয় উৎসর্জন।

জর্জ সেফেরিস

১৯৪৭

এলিঅটকে আমি দেখেছিলাম—ভদ্র, অমায়িক, এখন আগের থেকে আরও বয়স্ক, আরও ধূসর এবং মনে হয় খুবই ক্লান্ত। তাঁর মুখমণ্ডলে এখন এক জ্যোতির বিচ্ছুরণ যা আমার আগে নজরে আসেনি, আগে তাঁকে দেখে মনে হ'ত একজন বয়স্ক, উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার।

লরেন্স ডারেল

১৯৫০

ইএটস এবং পাউণ্ডকে আধুনিকতা আয়ত্ত করতে হয়েছিল, এলিঅট শুরু থেকেই ছিলেন আধুনিক।

লুই বঁগা

মিঃ এলিঅট হয়ে উঠেছেন এক জন-প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের একটা অংশ। ....মহান কবি শক্তিধর এলিঅটের আছে তাঁর নিজের সময়ের বিপদগুলি সম্বন্ধে এক গভীর উৎকণ্ঠা।

এফ. আর. লেভিস

১৯৫২

এলিঅটের কবিতাকে আমি মনে করি—শয়তানের কণ্ঠস্বর···।

এডওয়ার্ড ড্যলবার্গ

১৯৫৪

তুমি জানো এলিঅটের কবিতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা খুব ক্ষীণ।···এলিঅটের Quartets কবিতাকে আমি মনে করি খুবই মাঝারি মানের।

[হাবার্ট রিডকে লেখা এক চিঠিতে] **এডওয়ার্ড ড্যলবার্গ**

সচেতনভাবে আমি কারোর দ্বারা প্রভাবিত নয়। উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমি পাউণ্ড আর এলিঅটের কৃত্রিম উপায়ে নির্মিত কবিতার থেকে নিজেকে দূরে রাখি যাতে তাঁদের কোনোরকম প্রভাব আমার মধ্যে না আসে, এমনকি আমার অচেতন অবস্থাতেও।

ওয়ালেস স্টিভেনস

১৯৬০

গতরাতে এলিঅটের বাড়িতে অপূর্ব কাটল।..মনে হচ্ছিল, স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক দেবতার পাশটিতে বসে আছি; তাঁর চারপাশে মহত্ত্বের এক জ্যোতির্বলয় ...। অদ্ভুতভাবে তিনি ব্যঙ্গমুখর আর রসিকতায় আবিষ্ট।

সিলভিয়া প্লাথ

এলিঅটের কবিতা ১৯২০ আমি পেয়েছি ···। পাওয়ার পর কয়েক মাস কিছুই লিখতে পারিনি।····বইটাতে দুটো মহৎ কবিতা আছে যা পড়ে মনে

হ'ল আমি এরকমই লিখতে চেয়েছিলাম ....। এখন মনে হচ্ছে, লেখক না হয়ে আমার অন্য কিছু হওয়া উচিত ছিল....।

অ্যালেন টেট

আঙ্গিকের ব্যাপারে এলিঅটের ঘাটতি আছে; সেজন্যেই তিনি বারবার অঙ্গিকের প্রসঙ্গ তোলেন। The Waste Land কবিতাটি ঠিকমতো বলতে গেলে পাউণ্ড নতুন করে লিখেছিলেন এবং সেকারণেই এর আঙ্গিক এতো সুন্দর। পুরোপুরি আঙ্গিক বলতে কি তা এলিঅট বোঝেন না...। তাঁকে আঙ্গিক পেতে হয় অনুকরণের মাধ্যমে....। এখানেই হ'ল এলিঅটের দুর্বলতা।

রবার্ট ডানকান

টি. এস. এলিয়ট : জীবনপঞ্জী

১৮৮৮	২৬শে সেপ্টেম্বর জন্ম। সেণ্ট লুইস, মিসৌরি।
১৮৯৫-১৯০৬	স্কুলে পড়াশোনা।
১৯০৬-১৯১০	হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা। ১৯০৯ এ স্নাতক। ১৯১০-এ এম. এ.।
১৯১০-১৯১১	প্যারিসে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা।
১৯১১-১৯১৪	হার্ভার্ড থেকে দর্শনে পি. এইচ. ডি-র কোর্স শেষ করেন। দার্শনিক এফ. এইচ. ব্র্যাডলি বিষয়ে গবেষণা।
১৯১৪-১৯১৫	জার্মানীর মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংল্যাণ্ডে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ।
১৯১৫-১৯১৬	ভিভিয়েন হাই-উডের সঙ্গে বিবাহ। স্কুলে শিক্ষকতা এবং 'প্রেল্যুডস' প্রকাশ।
১৯১৭-১৯২৫	লয়েডস্ ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগদান।
১৯১৭	The Love song of J. Alfred Prufrock and other observations—প্রকাশিত।
১৯১৭-১৯১৯	The Egoist পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান।
১৯১৯	Poems, 1919 প্রকাশিত।
১৯২০	তৃতীয় কবিতার বই প্রকাশ—Poems, 1920 এছাড়াও প্রবন্ধের বই—The Sacred Wood।
১৯২২	The Waste Land কবিতার প্রকাশ এবং The Criterion পত্রিকার সম্পাদনা ১৯৩৯ পর্যন্ত সম্পাদনা অব্যাহত।ফেবার এণ্ড ফেবার প্রকাশনা সংস্থায় যোগদান, যেখান থেকে এলিঅটের পরবর্তী গ্রন্থগুলি প্রকাশ পায়।
১৯২৫	"Hollow Men" প্রকাশ। প্রকাশিত কবিতা বই —'The Hollow Men and Poems'.
১৯২৭	ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ। চার্চ অব ইংলণ্ডের স্বীকৃতি।
১৯৩০	Ash-Wednesday কবিতার প্রকাশ।
১৯৩২	প্রকাশিত হয় Selected Essays। ঐ একই

বছরের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়—The Use of Poetry & the Use of Criticism। প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদ।

১৯৩৪ After strange Gods—প্রকাশিত। The Rock অভিনীত হয়।

১৯৩৫ Burnt Norton—প্রকাশিত। এই বছরই Murder in the Cathedral মঞ্চে অভিনীত হয়।

১৯৩৯ The Family Reunion নাটকটি মঞ্চে অভিনীত হয়।

১৯৪০ East Coker প্রকাশিত।

১৯৪১ The Dry Salvages প্রকাশিত।

১৯৪২ Little Gidding প্রকাশিত।

১৯৪৮ ভিভিয়েন এলিয়টের মৃত্যু। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। প্রকাশিত—Notes towards the definition of Culture।

১৯৫০ The Cocktail Party নাটকটি মঞ্চে অভিনীত হয়।

১৯৫৭ ভালেরী ফ্লেচারকে বিবাহ।

১৯৫৮ শেষ নাটক—The Elder statesman, মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়।

লণ্ডনে গুরুতর অসুস্থ।

শেষবারের জন্য নিউ ইয়র্ক যাত্রা, শেষবারের মতো ভালেরি এলিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

লণ্ডনে মৃত্যু, জানুয়ারি ৪।

T. S. ELIOT : A BIBLIOGRAPHY

BOOKS :

1 Eliot, T. S. : The Sacred Wood, Methuen, London, 1957, first published in 1920.

2 Eliot, T. S. : For Lancelot Andrews Essays on Style and Order, Faber and Faber London, 1928.

3 Eliot, T. S. : John Dryden, the Poet, the Dramatist, the Critic, New York, 1932.

4 Eliot, T. S. : After Strange Gods : a primer of modern heresy, Faber and Faber London, 1934.

5 Eliot, T. S. : Essays Ancient and Modern, (a revised edition of For Lancelot Andrews) Faber and Faber London, 1936.

6 Eliot, T. S. : Notes Towards the Definition of Culture, Faber and Faber London, 1948.

7 Eliot, T. S. : The Idea of a Christian Society, Faber and Faber London, 1954.

8 Eliot, T. S. : On Poetry and Poets, Faber and Faber London, 1957.

9 Eliot, T. S. : Collected Plays, Faber and Faber London,

10 Eliot, T. S. : Collected Poems, Faber and Faber London, first published in 1936.

11 Eliot, T. S. : Selected Essays, Faber and Faber London, 1963, first published in 1951.

12 Eliot, T. S. : Elizabethan Dramatists, Faber and Faber London,

13 Eliot, T. S. : Knowledge and Experience in the philosophy of F. H. Bradley, Faber and Faber London,

14. Eliot, T. S. : The Use of Poetry and The Use of Criticism, Faber and Faber London, 1965, first published in 1933.

15. Eliot, T. S. : To Criticise the Critic, Faber and Faber London,

INTRODUCTION, PREFACES AND CONTRIBUTIONS TO BOOKS

1 Eliot, T. S. (ed) : The Criterion (1922-1939), in eighteen volumes Faber and Faber London,

2 Kipling, Rudyard : A Choice of Kipling's Verse, (made by T. S. Eliot) Faber and Faber London, 1963.

3 Knight, Wilson : The Wheel of Fire, (with an introduction by T. S. Eliot) Methuen London, 1960.

4 Monro, Alida (ed) : Collected Poems of Harold Monro, (with a critical note by T. S. Eliot) Cobden-Sanderson London; 1933.

5 Pound, Ezra : Seletcd poems of Ezra Pound, (with an introduetion by T. S. Eliot) Faber and Faber London, 1959.

6 Pound, Ezra : Literary Essays on Ezra Pound, (with an introduction by T. S. Eliot) Faber and Faber London, 1960.

7 Spencer, The od ore (ed) : A Garland for John Donne, Harvard University press Cambridge.

CONTRIBUTIONS TO PERIODICALS

1 ELIOT, T. S. : 'John Donne' Nation and Athenaeum. XXXIII 10, January 9, 1923.

2 EIOT, T. S. : 'Literature, Science and Dogma' Dial, Vol. LXXXII, 1927.

3 ELIOT, T. S. : 'The Silurist' Dial LXXXIII 3 September, 1927.

4 ELIOT, T. S. : 'The Poem of Richard Crashaw Dial LXXXIV. 1928.

5 ELIOT, T. S. : 'Poetry and Propaganda' The Bookman LXX, February, 1930.

6 ELIOT, T. S. : 'George Herbert' Spectator, March 12, 1932

7 ELIOT, T. S. 'The Need for Poetic Drama' The Listener, XVI, 25 November, 1936.

8 ELIOT, T. S. 'Ezra Pound' Poetry LXVIII, 6 September, 1946.

BOOKS : ON T. S. ELIOT

1. Bradbrook, M. C. : T. S. Eliot, Longmans London, 1955.

2 Braybrooke, Nevilie (ed) : T. S. Eliot : a symposium for his seventieth birthday, London and New York, 1958

3 Drew, Elizabeth : T. S. Eliot, the Design of his Poetry, Eyre and Spottis-woode London, 1950.

4 Freed, Lewis : T. S. Eliot : Aesthetics and His-

tory, Open Court, Illinois. 1962.

5 Frye, Northrop : T. S. Eliot. Oliver and Boyd, Edinburgh and London, 1963.

6 Gallup, Donald : T. S. Eliot. A Bibiliography, Faber and Faber London, 1952

7 Gardner, Helen : The Art of T. S. Eliot, Cresset Press, London, 1949.

8 George, A. G. : T. S. Eliot, His Mind And Art, Asia Publishing House,

9 Headings, P. R. : T. S. Eliot, College and University press New Haven, Conn., 1954.

10 Hoskot, S. S. : T. S. Eliot : His Mind and Personality, University of Bombay, Bombay,

11 Howarth, Herbert : Notes on Some Figures Behind T. S. Eliot, Chatto and Windus, London 1965.

12. Jones, David E. : The Plays of T. S. Eliot, Routledge and Kegan Paul London,

13 Kenner, Hugh : The Invisible Poet : T. S.Eliot, Methuen London,

14 Lal, P. (ed) : T. S. Eliot, Homage from India, Writers Workshop, Calcutta,

15 Lucy, Sean : T. S. Eliot and the Idea of Tradition, Cohen and West London, 1948

16 March, Richard and Tambimbultu : T. S. Eliot—A symposium, Edition Poetry London, 1948

17 Matthiessen, F. O. : The Achievement of T. S. Eliot, A Galaxy Book New York, 1959.

18 Maxwell, J. E. S. : Poetry of T. S. Eliot,

Routledge and Kegan Paul London, 1952.

19 Rajan, B (ed) : T. S. Eliot: a study of his writings, by several hands Funk and Wagnallis New york, 1948.

20 Roy, M.K. : T. S. Eliot : Search For A Critical Credo, Firma K. L. M. Cal.

21 Sen, Sunil Kanti : Metaphysical Tradition and T. S. Eliot, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta,

22 Smidt, Kristian : Poetry and Belief in the work of T. S. Eliot, Routledge and Kegan Paul, London, 1961.

23 Smith, Grover : T. S. Eliot's Poetry and Plays, The University of Chicago Press, Chicago, 1960.

24 Spender, S. Eliot, Fontana,

25 Stephenson, E. M. : T. S. Eliot and the Lay Reader, The Fortune Press, London, 1946.

26 Tate Allen (ed) : T. S. Eliot, The man and His Work, Chatto and Windus, London,

27 Unger, Leonard : T. S. Eliot, a Selected Critique, Rinehard and Company, New York, 1948.

28 Unger, Leonard : T. S. Eliot, Moments and Patterns, Univ. of Minnesota Press,

29 Williams, H. M. : T. S. Eliot : The Waste Land and Other Poems, Firma K. L. M., Calcutta,

30 Williams, Raymond : Drama from Ibsen to Eliot.

Chatto and Windus, London, 1961.

31 Williamson, George : A Reader's Guide to T. S. Eliot, Thames and Hudson, London, 1960.

32 Wilson, Frank : Six Essays on the Development of T. S. Eliot, The Fortune Press, London, 1948.

ARTICLES

1 Austin, Allen : 'Eliot's Theory of Personal Expression' PMLA Vol. LXXXI, June, 1966.

2. Borey, J. A. : 'The Literary Criticism of T.S. Eliot', American Prefaces, Vol. I, No. 5, 1936.

3 Braybrooke, Nevilie : 'Thomas Stearns Eliot' Contemporary Review 1940 (September 1958).

4 Brombart, Victor : 'T. S. Eliot and the Romantic Heresy' Yale Freneh Studies, No. 13 Spring-Summer 1954.

5 Collin, W. E. : 'T. S. Eliot, The Critic', The Sewanee Review, Vol.39, 1931.

6 Forster, E. M. : The Three T. S. Eliots', The Listener, January 20, 1949.

7 House, Humpherey : 'Mr. Eliot as a Critic' The Oxford Outlook Vol. 1, 1933.

8 Hyman, Edgar Stanley : 'Poetry and Criticism : T. S. Eliot', American Scholar Winter XXX.

9 Kermode, Frank : 'T. S. Eliot on Poetry' International Library Annual, London, 1958.

10 Kronenberger, Louis : 'T. S. Eliot as Critic', Nation 40 April 17, 1935.

11 Lawrence, Rigan : 'Hope for Eliot's Empty Men', PMLA, Vol. 73.

12 Leavis, F. R. : 'T. S. Eliot's Stature as a Critic', Commentary, Vol. 26, No. 5, November, 1958

13 Le Breen, Philip : 'T. S. Eliot and Henri Bergson' The Review of English Studies Vol. XVIII, No. 70,

14 Lynd, Robert : 'Mr. T. S. Eliot as a Critic', Books and Authors New York, 1923.

15 Mitra, S. N. : 'T. S. Eliot, and the Symbolist Aesthetic'. I. J. E. S. Vol.